টোয়েন্টি থাউজ্যান্ড লিগস্ আন্ডার দি সী

জুল ভার্ন অমনিবাস

BENGALIEBOOK.COM
★2022★

সূচিপত্র

তিমিজিল, না ডুবোপাহাড়? 3
আমি, পিয়ের আরেনা 7
ওই যে, ওখানে 12
অতল জলের আহ্বান 15
কোথাকার জংলি, এরা? 23
নটিলাস-এর কাপ্তেন নেমো 26
রাজা ও সন্ন্যাসী 33
অতল জলের পথিক 39
সিন্ধুতলের মৃগয়া 43
সিন্ধুয়োল 50
জিলবোয়ার জংলিরা 54
ভয়ংকরের গান 62
সিন্ধুতলে মুক্তো কুড়ুনো 69

নীল সাগর ভূমধ্য 75
সোনার সিন্দুক 80
সিন্ধুতলের কোষাগার....84
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ....90
লক্ষ্য : অবাচী 97
বনাম তুষারম....103
গগনের মাসকুণ্ডলী 109
নটিলাস-এর রোষ 115
পাগল হে নাবিক!....122
পুনশ্চ 126

তিমিমাছ, না ডুবোপাহাড়?

১৮৬৬ সালে হঠাৎ য়ুরোপ আর আমেরিকার নাবিকদের মধ্যে হুলুস্থুল বেঁধে গেলো। অদ্ভুত সব ব্যাপার ঘটছে সমুদ্রে-রহস্যময় ও বিপজ্জনক; প্রায়ই নাকি মস্ত কী-একটা জন্তু দেখা যাচ্ছে জলের মধ্যে। লম্বা ছুচোলো ঝকমকে একটা বিকট ব্যাপার কেবল যে আকারেই তিমিমাছের চেয়ে ঢের বড়ো তা-ই নয়, গতিবেগেও তিমির চেয়ে অনেক ক্ষিপ্র। অতিকায় কোনো সিন্ধুদানব, বিজ্ঞান যার কোনো হদিশ রাখে না? কোনো মস্ত শৈলশ্রেণী, ভূগোলবিদ্যায় যার উল্লেখ নেই? এসব প্রশ্নের উত্তর কেউ জানে না বলেই নাবিকদের মধ্যে আতঙ্ক ও জনরব শুরু হলো প্রবলভাবে; খবরের কাগজগুলোও ফলাও করে নানা সত্যিমিথ্যে প্রবন্ধ ছাপতে শুরু করলে; আর শেষটায় এমন কতকগুলো ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে গেলো যার ফলে নানা দেশের সরকার শুদ্ধ, এই মস্ত কী-একটাকে নিয়ে বিষম বিচলিত হয়ে পড়লেন।

এই অতিকায় বস্তুটিকে প্রথম দেখেছিলো গবর্নর হিগিনসন জাহাজটি। গবর্নর হিগিনসন ক্যালকাটা অ্যাণ্ড বার্নাক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজ; ১৮৬৬ সালের ২০শে জুলাই জাহাজটি ছিলো অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব-উপকূলে, ডাঙা থেকে পাঁচ মাইল দূরে; হঠাৎ দেখা গেলো জলের উপর অতিকায় চুরুটের মতো লম্বাটে গড়নের আশ্চর্য একটা জিনিশ ভাসছে। ক্যাপ্টেন বেকার গোড়ায় ভেবেছিলেন বুঝি কোনো ডুবোপাহাড়ই আবিষ্কার করে ফেলেছেন তিনি; কাটা-কম্পাস দিয়ে সবে তিনি মানচিত্রে তার অবস্থান নির্ণয় করতে যাচ্ছেন, অমনি হঠাৎ, বলা নেই কওয়া-নেই, হুড়মুড় করে ওই ডুবোপাহাড় থেকে ভীষণ দুটি জলন্ত উঠলো প্রচণ্ড বেগে–প্রায় দেড়শো ফুট অবধি। সেই জলস্তম্ভ থেকে আবার–

কিমাশ্চর্য!–ধোয়া আর বাষ্পও উঠছে। উষ্ণ প্রস্রবণ আছে তাহলে ওই ডুবোপাহাড়ে? না কি আদৌ কোনো ডুবোপাহাড়ই নয়, বরং মস্ত কোনো তিমিজিল? কিন্তু তিমিজিল থেকে বাষ্পময় জলস্তম্ভ ওঠে, একথা তত কদাপি শোনা যায়নি। ক্যাপ্টেন বেকার কিঞ্চিৎ হতভম্ব হয়ে পড়লেন।

তিন দিন পরে-২৩শে জুলাই-ওয়েস্ট-ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড প্যাসিফিক স্টীম নেভিগেশন কোম্পানির জাহাজ কলম্বাস ঠিক এই অদ্ভুত তিমিজিলটিকেই দেখলো প্রশান্ত মহাসাগরে—অর্থাৎ প্রায় ২১০০ মাইল দূরে। আরেকটা অতিকায় সিন্ধুদানব? না কি সেটাই তিন দিনের মধ্যে এতদূরে চলে এসেছে? তা যদি হয় তাহলে এই ভাসমান গিরিশৃঙ্গটির গতিবেগ অবিশ্বাস্য বলতে হয়। তা-যে রয়েছে, তা বোঝা গেলো যখন পনেরো দিন পরে তাকে দেখা গেলো ৬০০০ মাইল দূরে অতলান্তিক মহাসাগরে। ফরাশি জাহাজ হেলভেটিয়া আর ব্রিটিশ জাহাজ খান ঠিক তার মুখোমুখি পড়লো। এই জাহাজ দুটি আবার মাপটাপ নিয়ে দেখলো যে এই অতিকায় সিন্ধুদানব কিছুতেই সাড়ে তিনশো ফুটের কম হবে না। কিন্তু এযাবৎ কেউ ষাট ফুটের চেয়ে বড় তিমি দেখেছে বলে শোনা যায়নি। ফলে পরপর এই মস্ত কী-একটার খবর পেয়ে য়ুরোপ-আমেরিকার নৌ-জগতে সাড়া পড়ে গেলো। এ আবার নতুন কোন মবি ডিক–হুজুগ পেয়ে ফলাও করে প্রশ্ন তুলো কাগজগুলো।

সমস্ত জল্পনারই উত্তর এলো ১৮৬৭ সালের ১৩ই এপ্রিল যখন কটিয়া নামে মস্ত-একটি জাহাজ এই সিন্ধুদানবের প্রথম বলি হলো। অতলান্তিক মহাসাগরে কেপ-ক্লিয়ারের তিনশো মাইল দূরে তরতর করে দিব্যি ছুটে চলছিলো স্কটিয়া। আচমকা কীসের সঙ্গে যেন ছোট্ট-একটু ধাক্কা লাগে তার এত-আস্তে ধাক্কাটা লাগে যে গোড়ায় কেউ কিছু টেরও

পায়নি। কিন্তু নাবিকদের একজন হঠাৎ দেখতে পেলে যে ছফুট চওড়া একটা মস্ত ফুটো দিয়ে হু-হু করে জল ঢুকছে জাহাজের ঘোলে। সেই অবস্থাতেই ডুবু-ডুবু সেই জাহাজটিকে তক্ষুনি কোনোরকমে লিভারপুল বন্দরে নিয়ে আসা হলো। তারপর মেরামত করার জন্য জাহাজটিকে ড্রাইভকে তুলেই তো সবাই স্তম্ভিত! লোহার পুরু চাদরে পরিষ্কার একটা তেকোণা গর্ত; যেন কোনো চোখা তুরপুন চালিয়ে জাহাজটিকে কেউ জখম করে দিয়েছে।

ব্যাস, আর দেখতে হলো না! হুলুস্থুল বেঁধে গেলো সর্বত্র। পৃথিবীর প্রত্যেকটা খবরের কাগজে এই রহস্যময় দানবের গল্প ছাপা হতে লাগলো। নানা রকম খিয়ারি আর আজগবি তথ্যে বন্দরগুলি আতঙ্কে ও উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপতে লাগলো। কেউ বললে জানোয়ারটা আসলে একটা অতিকায় সামুদ্রিক সরীসৃপ-পুরাণ আর কিংবদন্তি থেকে তারা নিজেদের মতের পক্ষে নানা নজির দিলে। কেউ আবার বললে ওটা মোটেই কোনো ডুবোপাহাড় বা গিরিশৃঙ্গ নয়, বরং মবি ডিকের মতোই কোনো দানোয়-পাওয়া মস্ত তিমি; আর তা না-হলে আরেক দল বললে নিশ্চয়ই কোনো শক্তিশালী ডুবোজাহাজ। ডুবোজাহাজ যদি হয়, কাগজগুলো রব তুললো, তাহলে বিষম ভয়ের কথা। কেননা চুপিসাড়ে লোকচক্ষুর আড়ালে এ-রকম একটা বিপুল যন্ত্র তৈরি করতে গেলে যে-পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন, তা কেবল কোনো দেশের গবর্মেন্টেরই থাকতে পারে। আর, কোনো দেশের সরকারের হঠাৎ গোপনে ডুবোজাহাজ বানাবার প্রয়োজন হলো কেন? কী তার উদ্দেশ্য?

তক্ষুনি খবর নেয়া হলো সর্বত্র। ইংল্যাণ্ড, ফ্রান্স, রাশিয়া, জর্মানি, এস্পানিয়া, ইলি, আমেরিকা, এমনকী তুরানদেশে পর্যন্ত খবর নেয়া হলো নানাভাবে। কিন্তু সব দেশেরই

সরকার একবাক্যে অস্বীকার করলে-এ-রকম ডুবোজাহাজ যে সত্যি আছে, তা-ই নাকি তারা জানে না। আর এই সম্ভাবনাটাও যখন মিথ্যে বলে জানা গেলো, তখন গুজব ও জনরব আরো অস্থির-বিপুল আকার ধারণ করলে। নাবিকরা আর এমনিতেই খুব কুসংস্কার মানে; ফলে এমন-একটি দানবের মুখোমুখি পড়ার ভয়ে তারা যেন প্রায় শিঁটিয়ে গেলো।

এই অদ্ভুত জুজুর আতঙ্কে নাবিকরা যখন ভয়ে কাঁপছে, আমি তখন নিউইয়র্কে প্রাকৃতিক ইতিহাস নিয়ে গবেষণা করছি।

আমি, পিয়ের আরোনা

আমার নাম পিয়ের আরোনা। পারী মিউজিয়ামের প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক আমি। সেই সূত্রেই আমাকে কিছুকাল আগে নেব্রাস্কা যেতে হয়েছিলো অতীব দুষ্প্রাপ্য কিছু উদ্ভিদ প্রাণীসংগ্রহের অভিযানে। ফ্রান্সে ফেরার পথে নিউইয়র্কে এসে আমি যখন সংগৃহীত জিনিশগুলির একটা তালিকা তৈরি করছি, তখনই এই অতিকায় সিন্ধুদানবের জনরব বিস্ফোরণের মতে ফেটে পড়লো।

সত্যি এটা কোনো সামুদ্রিক প্রাণী কিনা প্রাকৃতিক ইতিহাসের অধ্যাপক বলে এ-সম্বন্ধে মতামত চাওয়া হলো আমার কাছে। নিউইয়র্ক হেরাল্ড কাগজের প্রতিনিধির অনুরোধে ৩০শে এপ্রিল আমি একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলুম। সমুদ্রতল যে এখনো কৌতূহলী ও উন্মুখ মানুষের কাছে বিষম রহস্যের আধার, এটাই ছিলো আমার প্রবন্ধের মূল বক্তব্য। পৃথিবীর মাত্র একভাগ স্থল, বাকি তিনভাগই জল-আর সেই জলের তলায় কী আছে, তার কতটুকুই বা আমরা জানি। আমরা কেবল কতগুলো অনুমান ও ধারণা করতে পারি মাত্র। যদি সমুদ্রতলের সমস্ত জীবদের কথাই আমরা এতদিনে জানতে পেরে থাকি, এবং যদি বিভিন্ন দেশের সরকার সত্যিই কোনো প্রবল ও গোপন ডুবোজাহাজের অস্তিত্ব অস্বীকার করে থাকেন, তাহলে বলা বাহুল্য আমি প্রবন্ধে বললুম–জিনিশটি আসলে একটি অতিকায় নারহোয়াল–অর্থাৎ বিকট খঙ্গের মতো দন্তময় সেই মহাকায় সামুদ্রিক ড্রাগন, মেরুবলয়ের হিমজল যার গোপন আবাস। অবশ্য নারহোয়ল যে ষাট ফুটের বেশি লম্বা হয়, তা এতকাল আমরা জানতুন না—অথচ নানা তথ্য থেকে জানা গেছে যে এই হিংস্র ও খুনে নারহোয়ালটি প্রায় সাড়ে তিনশো ফুট লম্বা। এমন হতে পারে যে

আদিকালের একটি নারহোয়ল প্রকৃতির কোনো অদ্ভুত খেয়ালে এই উনবিংশ শতাব্দীর আধুনিক কালেও কোনোক্রমে বেঁচে ছিলো—সে-ই হঠাৎ সমুদ্রতল আলোড়িত করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তাকে নারহোয়ল বা সী-ইউনিকর্ন বলে মনে করার কারণ স্কটিয়া জাহাজের লোহার পুরু চাদরের খোলের মধ্যে ওই বিপুল ও আকস্মিক ছাদাটি-কারণ কেবলমাত্র নারহোয়ালেরই মাথায় ইস্পাতের মতো কঠিন ও সুদৃঢ় খঙ্গ থাকে, যার এক ধাক্কায় এমনকী লোহার পুরু চাদর শুদ্ধ, ফুটো হয়ে যেতে পারে। অবশ্য আমার এই আন্দাজ যে পুরোপুরি সত্যি, তা বলি না। কারণ এই অতিকায় জীবটি সম্বন্ধে হয়তো সমস্ত তথ্য এখনও আমরা জানি না।

আমার প্রবন্ধের সারমর্ম মোটামুটি এই। কিন্তু এই প্রবন্ধ বেরুবার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে নানারকম জল্পনা শুরু হয়ে গেলো। এদিকে আবার আরো জাহাজডুবির খবর আসতে লাগলো; সবাই যে এই নারহোয়লের খড়ের আঘাতের ফল, তা নয়। তবু চারদিকে একটা বিষম আতঙ্কের রেশ পড়ে গেলো। সবাই ভাবলে যে এই অতিকায় খুনে জীবটিই বুঝি সব সর্বনাশের মূল।

অবস্থা যখন এইরকম, তখন মার্কিন নৌবহর স্থির করলে যে এই সামুদ্রিক আতঙ্ক দূর করার জন্যে তারা একটি যুদ্ধজাহাজ পাঠাবে। সমুদ্রের এই বিভীষিকার সঙ্গে সরাসরি লড়াই করবে এই জাহাজ; মস্ত কামানওলা এই জাহাজটির নাম অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন। অভিযানের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে ক্যাপ্টেন ফ্যারাটের ওপর; তার অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিমত্তা এই বিভীষিকাটি নিপাত করার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

ব্রুকলিন জাহাজঘাটা থেকে আব্রাহাম লিঙ্কন ছেড়ে যাওয়ার ঠিক তিন ঘণ্টা আগে আমার কাছে নিচের চিঠিটা এসে পৌঁছুলো।

মহাশয়, অনুগ্রহপূর্বক আপনি আব্রাহাম লিঙ্কনের সামুদ্রিক অভিযানে যোগদান করিলে যুক্তরাষ্ট্রের সরকার আপনার মাধ্যমে ফরাশি দেশকে ইহাতে লাভ করিতে পারিনা অনুগৃহীত ও আনন্দিত হইবে। ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট আপনার জন্য একটি কেবিন নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন।

বশম্বদ
মার্কিন নৌবহরের সম্পাদক
জে. বি. হবসন।

এই চিঠি পাবার আগে, চাঁদে পাড়ি দেবার মতে, এই সামুদ্রিক অভিযানে বেরোবার সম্ভাবনাটা স্বপ্নেও আমার মনে জাগেনি। কিন্তু হঠাৎ এই চিঠিটা পাবার পরই মনে হলো পৃথিবীর সব সম্পদের বিনিময়েও এই সোনালি সুযোগ আমি হাতছাড়া করতে পারবো না।

তক্ষুনি অধীরভাবে আমার পরিচারক কোনসাইলকে ডাক দিলুম। কোনসাইল আসলে ওলন্দাজ, সাহসী বিশ্বস্ত ও অনুগত। আমার সমস্ত অভিযানেই সে সঙ্গী হয়, কোনো প্রশ্ন তোলে না, নীরব কর্মীর মতো সমস্ত করে ফ্যালে মুহূর্তে, কোনো কিছুতেই তার বিস্ময় নেই। ফলে ক্ষিপ্রহাতে জিনিশপত্র গোছাতে-গোছাতে কোনসাইল যখন শুনলো যে আমরা এবার এই সিন্ধুদানবের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরোচ্ছি, সে মোটেই অবাক হলো না; আমার

কথার ফাকে-ফাকেই চটপট সে সব গুছিয়ে নিলে। আমার অভিযানের নিদর্শন ও সংগ্রহগুলো আমি পারী বিচিত্রা ভবনে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিলাম। অতঃপর যখন কোচবাক্সে বসে আমরা নিউইয়র্কের জাহাজঘাটায় পৌঁছোলুম, তখন দেখি অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন তার সামুদ্রিক অভিযানের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছে তার মস্ত দুটি চিমনি দিয়ে ভলকে ভলকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে।

তক্ষুনি আমাদের মালপত্র জাহাজে তুলে ফেলা হলো। আমরাও জাহাজে গিয়ে উঠলুম। একজন নাবিককে জিগেস করতেই সে আমাকে এক হাসিখুশি অফিসারের কাছে নিয়ে এলো। তিনি আমাদের দেখেই হাত বাড়িয়ে দিলেন। জিগেস করলেন, মঁসিয় পিয়ের আরোনা?

আমি স্বয়ং, উত্তর দিলুম আমি, আপনি ক্যাপ্টেন ফ্যারাশুট তো?

সশরীরে বর্তমান। আপনার কামরা তৈরি আছে, প্রফেসর।

তাঁকে ডেকের উপরে রেখেই কোনসাইলকে নিয়ে আমি আমার কেবিনে গিয়ে ঢুকলুম।

লং-আইল্যাণ্ডের হলদে বেলাভূমি ছেড়ে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন যখন তার অভিযানে বেরোলো, তখন তিনটে বাজে! তীরে হাজার-হাজার নরনারী দাঁড়িয়ে রুমাল উড়িয়ে আমাদের বিদায় জানালে। এমনকী মস্ত একটা বড়োপাল্লার কামান থেকে তোপধ্বনিও করা হলো আমাদের বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে। রাত যখন আটটা, তখন ফায়ার-আইল্যাণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব দিয়ে অতলান্তিক মহাসাগরের ফেনিল, কালো ও রহস্যময় জলের মধ্যে গিয়ে পড়লো, অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন।

তিমি শিকারের যাবতীয় শরঞ্জাম টাল করে রাখা ছিলো জাহাজে। কেবল যে হাতে ছোড়ার শাদাশিধে হারপুনই ছিলো তা নয়, এমনকি অতি-আধুনিক হারপুন-বন্দুক শুদ্ধ, বাদ যায়নি। আর ছিলো নেড ল্যাণ্ড-হারপুন ছোড়ার রাজা। বয়েস তার চল্লিশের মতো আমারই প্রায় সমান–; ঢ্যাঙা, অসুরের মতো চেহারা, ছ-ফুটের উপর লম্বা, গম্ভীর অথচ দিলদরিয়া, কিন্তু যখন তখন ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারে; ক্ষিপ্রতায়, দুঃসাহসে ও কৌশলে তার জুড়ি নেই বলেই কোনো অতি চালাক তিমির পক্ষেও তার হারপুনকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না। তীক্ষ্ণ-প্রবল দৃষ্টিশক্তি তার মুখের মধ্যে দৃঢ়তার রেশ এনে দিয়েছে। এই অকুতোভয় মানুষটিকে নিয়োগ করে ক্যাপ্টেন ফ্যারাসুট যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাট অবশ্য আরেকটি কাজও করেছিলেন। ওই খুনে জানোয়ারটাকে যে সবচেয়ে আগে দেখতে পাবে, তাকে দু-হাজার ডলার পুরস্কার দেয়া হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন তিনি। ফলে সকলেরই উৎসাহ খুব বেড়ে গিয়েছিলো। প্রত্যেকেই দিনরাত ডেকের উপর দাঁড়িয়ে সমুদ্রের অথৈ জলরাশির দিকে তাকিয়ে থাকতো।

কিন্তু কোথায় কী? সেই অতিকায় সিন্ধুদানবের কোন পাত্তাই পাওয়া গেলো না। শেষকালে কেপ হর্ন পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে গিয়ে পড়লুম আমরা। কিন্তু তবু সেই সিন্ধুদানবের কোনো চিহ্নই নেই। তবে কি সমস্ত জনব আসলে কোনো অমূল কল্পনা? কোনো অলীক স্বপ্নবিলাস? তা কেমন করে হয়? কারণ স্কটিয়ার সেই মস্ত ছিদ্রটি তত মিথ্যে নয়।

তাহলে?

ওই যে, ওখানে

কোনসাইল-এর যে দু-হাজার ডলার পুরস্কারের প্রতি কোনো লোভ ছিলো না, তা নয়। কিন্তু আমার বেলায় ব্যাপারটা ছিলো সম্পূর্ণ অন্য রকম। পুরস্কারের তোয়াক্কা রাখি না আমি। কিন্তু তবু কিসের টানে আমিও ঘণ্টার পর ঘণ্টা ডেকের উপর দাঁড়িয়ে থাকতুম। আমি নিজের চোখে এই সিন্ধুদানবকে দেখতে চাই। জানতে চাই সে আসলে কোনো অতিকায় নারহোয়াল বা কিংবদন্তির সিন্ধুড্রাগন কিনা। কিন্তু দিনের পর দিন একটানা তাকিয়ে থেকে কেবল চোখ দুটিই টনটন করতে লাগলো–হঠাৎ ঢেউয়ের মধ্যে ভেসে-ওঠা কালো তিমির বিশাল পিঠ ছাড়া আর কিছুই চোখে পড়লো না, কোনো সাদা তিমি বা কোনো বিপুল মবি ডিক পর্যন্ত না।

সাতাশে জুলাই আমরা বিষুবরেখা ছাড়িয়ে এলুম। জাপানের দিকে এগিয়ে চললুম আমরা। কিন্তু নাবিকেরা ততক্ষণে ধৈর্যের শেষ সীমায় পৌঁছেছে। তারা কিছুতেই আর এই অর্থহীন কল্পনাবিলাসের পিছনে ঘুরে বেড়াতে চায় না। শেষকালে তাদের চাপে পড়ে ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটকেও ক্রিস্টোফার কলম্বাসের মতো বলতে হলো যে আর তিনদিনের মধ্যে যদি এই সিন্ধুদানবের সন্ধান না পাওয়া যায় তাহলে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কনকে তিনি আবার নিউইয়র্কে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন। কে কোথায় নেশার ঘোরেরে কোন আজব ও অতিকায় একটি জীব দেখেছে, সেই জন্যে সেই বন্য হংসের পিছনে হুড়মুড় করে ছুটে বেড়ানোর কোনো মানে হয় না। বামকাই এত পথ এলো অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন–কোনো অলীক বুনো হাঁসের পিছন পিছন।

দু-দিন কেটে গেলো। টোপ ফেলে সিন্ধুদানবটাকে কাছে আনার জন্য বড়োবড়ো মাংসের টুকরো ফেলা হতে লাগলো জলের মধ্যে, এবং তার ফলে হাঙরদের মধ্যে ভোজ শুরু হলো বটে, কিন্তু সেই সিন্ধুদানবের রহস্য পূর্ববৎ সেই একই অনন্ত তিমিরে ঢাকা রয়ে গেলো।

জাপান তখন আর মাত্র দু-শশা মাইল দূরে। আরেকটা দিনও যদি এমনিভাবে কেটে যায়, তাহলে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন আর মিথ্যে বুনো হাঁসের পিছনে না-ফুটে দেশে ফিরে যাবে।–ঢং করে রাত্রি আটটা বাজলো। আমরা অনেকেই উদগ্রীবভাবে ডেকের উপর দাঁড়িয়ে আছি; যদি শেষমুহূর্তে দানবটির দর্শন পাওয়া যায়, এই প্রত্যাশায়।

কোনসাইলের স্নায়ু বলে কোনোকিছু কোনোকালে ছিলো বলে আমি টের পাইনি। কিন্তু এখন তাকেও কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত দেখা গেলো। হেসে বললুম, কোনসাইল, ওই দুহাজার ডলার পকেটস্থ করার এই শেষ সুযোগ তোমার। দ্যাখো, পারো কিনা।

মঁসিয় কি দয়া করে আমাকে এ-কথা বলার সুযোগ দেবেন যে আমি কোনো দিনই পুরস্কারের প্রত্যাশা করিনি–যুক্তরাষ্ট্রের সরকার যদি লাখ ডলারও পুরস্কার ঘোষণা করতেন, তাহলেও তাদের কিছুতেই ওই টাকাটা হারাতে হতো না। কারণ ওই রকম কোনো সিন্ধুদানব কদাচ ছিলো কি না তাই আমার সন্দেহ হচ্ছে।

তুমি ঠিকই বলেছে, কোনসাইল। আমরা যে কেবল ছ-মাস সময় খামকা নষ্ট করলুম, তা-ই নয়–ফিরে গিয়ে দেখবো লোকের কাছে রীতিমতো হাস্যাস্পদ হয়ে উঠেছি

ঠিক তক্ষুনি নেড ল্যাণ্ডের প্রবল চীৎকার শোনা গেলো! ওই-যে! আমরা যাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি, অবশেষে সেই-তিনি সশরীরে হাজির! ওই-যে, ওখানে!

অতল জলের আহ্বান

নেডের চীৎকার শুনে জাহাজের সব লোক তার দিকে ছুটে গেলো। এবার কিন্তু সিন্ধুদানব আর কারো অগোচর রইলো না। দেখতে পেলুম জাহাজ থেকে বেশ খানিকটা দূরে সমুদ্রের জল আলো হয়ে উঠেছে; জলের উপর ভেসে উঠেছে সেই রহস্যময় দানবটির প্রকাণ্ড পিঠ, আর তার গা থেকেই এই উজ্জ্বল চোখ-ধাঁধানো আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। কিন্তু তখন আর ভালো করে ধীরে-সুস্থে তাকে অবলোকন করার অবস্থা ছিল না; কারণ সচমকে আমরা দারুণ আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করলুম, দানবটা প্রচণ্ড বেগে আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে।

জাহাজের মধ্যে যে-সমস্বর শোরগোল উঠলো, তাতে আমার সভয় চীৎকার ঢাকা পড়ে গেলো। কিন্তু তারই ভিতর অবিচল রইলেন শুধু ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট। তার নির্দেশমতো বোকরে অর্ধবৃত্তাকার পথে ঘুরে গিয়ে আব্রাহাম লিঙ্কন ধাবমান দানবটির কাছ থেকে সরে যেতে লাগলো। কিন্তু দ্বিগুণ বেগে আমাদের দিকে ধেয়ে আসতে লাগলো সমুদ্রের সেই প্রজ্বলন্ত বিভীষিকা। কিন্তু তারপরেই–আবার আশ্চর্য!-হঠাৎ এক জায়গায় সে থমকে দাঁড়িয়ে গেল, তারপর আস্তে জাহাজটার চারপাশ একবার প্রদক্ষিণ করে নিলো–যেন কোনো শিকারী জন্তু চড়াও হবার আগে তার শিকারের ক্ষমতা ও সাধ্য আন্দাজ করে নিতে চাচ্ছে। কলের জাহাজ যেমন যাওয়ার সময় পেছনে লম্বা ও কুণ্ডলিত ধোয়ার রেখা রেখে যায়, ঠিক তেমনি পুঞ্জীভূত আলোকিত কুয়াশার রেখা একে গেলো জলের মধ্যে, তারপর অবিশ্বাস্য গতিতে তার পরিক্রমা সম্পূর্ণ করে জানোয়ারটা আচম্বিতে জাহাজ লক্ষ্য করে উল্কার মতো ধেয়ে এলো।

শামাল। শামাল। রব উঠলো জাহাজে। কিন্তু জাহাজের একেবারে মুখোমুখি এসেই আচমকা সেই তীব্র আলোর চ্ছটা মিলিয়ে গেলো। পরক্ষণেই জাহাজের অন্যধারে দেখা গেলো সেই প্রজ্বলন্ত বিভীষিকা। রাতের অন্ধকারে আমরা ঠাহরই করতে পারলুম না জানোয়ারটা ডুব দিয়ে ওধারে গেলো, না জাহাজটিকে নিছকই প্রদক্ষিণ করে গেলো।

অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন তখন ঝপাঝপ আলো নিভিয়ে দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। অবাক হয়ে ক্যাপ্টেন ফ্যারাটকে জিগেস কললুম, ব্যাপার কী?

রাতের অন্ধকারে ওই অদ্ভুত জানোরারটার সঙ্গে লড়াই করে তো আর আমার জাহাজ আর লোকজনের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারি না, ক্যাপ্টেন বললেন, কাল দিনের বেলায় দেখবো সমুদ্রের ওই শক্ত কত শক্তি ধরে।

সে রাতে কারো চোখেই একফোঁটা ঘুম নামলো না। উত্তেজনায় ও আতঙ্কে সবাই কেমন টান-টান হয়ে আছে—তীর ছোড়ার আগে ধনুকের ছিলা যেমন টান হয়ে যায়। সবাই রুদ্ধশ্বাসে জানোয়ারটার গতিবিধি লক্ষ্য করার চেষ্টা করছে, কিন্তু মাঝরাত্রে হঠাৎ সেই সিন্ধুদানব যেন কোন অতলে মিলিয়ে গেলো। যেন দপ করে কোনো অতিকায় জোনাকি নিভে গেলো অকস্মাৎ। কিন্তু শেষরাতের দিকে আবার সেই বিচিত্র আলো দেখা গেলো সামনে। সেই সঙ্গে শোনা গেলো জলে ল্যাজ আছড়ানোর আক্রোশ ফোঁস-ফোঁস নিশেস ছাড়ার ভয়ংকর ও অলক্ষুণে আওয়াজ।

আক্রমণ শুরু হলো প্রাতঃকালে। সকাল হতে না হতেই হারপুন বাগিয়ে নেড তার নিজের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ালো। তারপর পুরোদমে ইঞ্জিন চালিয়ে দেয়া হলো।

জ্বলন্ত লাল বলের মতো তখন সূর্য উঠছে দিগন্তে, আর জানোয়ারটার সেই উগ্র আলো যেন নিভে গেছে মন্ত্রবলে। মাইল দু-এক দূরে ঢেউয়ের উপরে তার অতিকায় কালো শরীর ভেসে আছে। তিমিমাছের মতো স্তম্ভের আকারে জলের ধারা সে ছুঁড়ে দিচ্ছে প্রায় চল্লিশ ফুট উঠে গেছে সেই জলস্তম্ভ। আমাদের জাহাজ ক্যাপ্টেনের নির্দেশ অনুযায়ী পুরোদমে জন্তুটির দিকে ছুটে যাচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্য, দিগন্ত যেমন করে পিছিয়ে যায়, মরীচিকা যেমন করে সরে যেতে থাকে, তেমনিভাবে জন্তুটিও কেবল পিছিয়ে যাচ্ছে তখন দূরত্বটা আর কিছুতেই কমছেনা।

ক্যাপ্টেন ফ্যারাশুট আরো জোরে জাহাজ চালাতে নির্দেশ দিলেন, ইঞ্জিনের প্রচণ্ড নির্ঘোষ উঠলো সবকিছুকে ছাপিয়ে; কোনো-এক অতিকায় হৃৎপিণ্ডের মতো আস্ত জাহাজটা যেন ধ্বক-ধ্বক করে বেজে উঠছে, থরোথরো কেঁপে উঠছে আস্ত পাটাতনটি। কিন্তু দূরত্বটা সমান রেখে ঠিক ততখানি বেগেই জানোয়ারটা দূরে চলে যাচ্ছে–যেন কোনো মজার খেলায় সে মেতে উঠেছে।

দূরত্ব যখন একটুও নাকমে একই থেকে গেলো আগের মতো, ক্যাপ্টেন তখন কামান দাগার আদেশ দিলেন।

কামানের নির্ঘোষ মেলাবার আগেই দেখা গেলো জন্তুটির মসৃণ কঠিন চামড়ার উপর গোলাটা পিছলে গিয়ে সমুদ্রের জলে ঠিকরে পড়লো।

এই পশ্চাদ্ধাবন চললে সারাদিন ধরে। শেষকালে বেলা পড়ে এলো ধীরে ধীরে, ডুবে গেলো সূর্য, নেমে এলো অন্ধকার; আর সেই অন্ধকারে অদ্ভুত এই জন্তটারও আর-কোনো

হদিশ পাওয়া গেলো না। কিন্তু রাত যখন এগারোটা, হঠাৎ মাইল তিনেক দূরে গত রাত্রির মতোই সমুদ্রের বুকে আবার জ্বলে উঠলো সেই চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলো- তাছাড়া আর কোনো সাড়াশব্দ নেই তার। সারা দিনের পরিশ্রমে তাহলে কি অবসন্ন দানবটি ঘুমিয়ে পড়েছে?

অন্তত ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুটের তা-ই ধারণা হলো। সুবর্ণ সুযোগ মনে করে সন্তর্পণে জাহাজটিকে তার দিকে নিয়ে যাবার নির্দেশ দিলেন তিনি। ইঞ্জিন বন্ধ করে দিয়ে নিঃশব্দে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন সেই প্রজ্বলন্ত কালো দানবটির দিকে এগিয়ে গেলো।

আর মাত্র বিশ ফুট দুরে পড়ে আছে দানবটা, নিঃসাড়, কালো ও উজ্জ্বল। নেড ল্যাণ্ড আর একটুও দেরি না করে প্রচণ্ড বেগে তার হারপুন ছুড়লে জন্তুটির দিকে। ঠক! একটা চাপা শব্দ উঠলোহারপুনটা দানবটার গায়ে আছড়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে।

অমনি, নিমেষের মধ্যে, সেই উজ্জ্বলপ্রবল আলো নিভে গেলো। প্রচণ্ড দুটি জলের ধারা এসে পড়লো জাহাজের উপর, যেন কোনো সিন্ধু-ঐরাবত তার ওড় দিয়ে জল ছুঁড়ে মারছে। প্রচণ্ড জা‌েড়ে মুহূর্তে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলো। মাস্তুল ভেঙে পড়লো মুহূর্তে, ছিঁড়ে গেলো দড়ি-দড়া, নাবিকরা আছড়ে পড়লো এ ওর গায়ে। প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি অনুভব করলুম আমি, তারপরেই রেলিঙের উপর দিয়ে সমুদ্রে ছিটকে পড়লুম।

এত জোরে ছিটকে পড়েছিলুম যে তলিয়ে গিয়েছিলুম প্রথমটায়! কিন্তু সাঁতার জানা ছিলো বলে ভেসে উঠতে পারলুম। সাঁতার দিতে দিতে তাকিয়ে দেখি পুবদিকে ধীরে ধীরে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন-এর আবছা ছায়া মিলিয়ে যাচ্ছে।

খ্যাপার মত চীৎকার করতে লাগলুম আমি কিন্তু জাহাজের কেউ আমার সেই চীৎকার শুনতে পেলো বলে মনে হলো না। প্রাণপণে হাত-পা চালিয়ে সাঁতার কেটে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলুম কেবল; কিন্তু সেটাও মস্ত ভুল হলো—তার ফলে অল্পেতেই ভয়ানক ক্লান্ত লাগলো নিজেকে; নিশেস বন্ধ হয়ে আসছে ক্রমশ; বুঝতে পারছি যে ডুবে যাচ্ছি কিন্তু কিছুই করার নেই; ভিজে ভারি পোশাকে হাত-পা যেন লোহার মতো ভারি হয়ে উঠেছে।

কয়েক ডোক নোজল খেয়ে যখন তলিয়ে গেছি, তখন শক্ত মুঠোয় আমার জামার কলার চেপে ধরে যে আমাকে টেনে তুললো, সে আমার অনুগত ভৃত্য কোনসাইল।

কোনসাইল! তুমি! অনেক চেষ্টা করে এই দুটি কৃতজ্ঞ ও বিস্মিত কথাই আমি উচ্চারণ করতে পারলুম।

হ্যাঁ, মঁসিয়, আমি। আপনি জলে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আমিও আপনার পিছনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম।

কিন্তু আব্রাহাম লিঙ্কন? আমাদের জাহাজ? সে যে চলে গেলো-

কিছুই করার নেই তাদের, মঁসিয়। জন্তুটার দারুণ কামড়ে জাহাজের হাল আর চাকা খণ্ড-খণ্ড হয়ে গেছে। কাজেই অথৈ জলে নিরুপায়ভাবে নিয়ন্ত্রণবিহীন ভেসে-যাত্মা ছাড়া তাদের আর কিছুই করার নেই। জলে পড়ার আগেই নাবিকদের চাচামেচিতে এই খবরটা জানতে পেরেছিলাম বলেই আমি আর খামকা ওদের ডাক দিই নি।

তাহলে উপায়? বুদ্ধিভ্রংশের মতো অসহায়ভাবে কোনসাইলকে আমি জিগেস করলুম।

আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে, ছুরি বার করে আমার পোশাক কেটে কোনসাইল আমাকে ভারমুক্ত করে দিলে। তারপর নিজের পোশাকও অমনিভাবে ছুরি দিয়ে কেটে সে বিসর্জন দিলে। অতঃপর শুরু হলো পালা করে একজনের সাঁতার কাটা আর অন্য জনের ভাসমান দেহকে ঠেলে-নিয়ে-যাওয়া। অকুল সমুদ্রের মধ্যে এ-ভাবে সাঁতার দিয়ে লাভই বা কী? কতক্ষণ আর এভাবে জলের উপর ভেসে থাকতে পারবো? কিন্তু একেবারে হাল না ছেড়ে দিয়ে কিছু-একটা করা ঢের ভালো-এই কথা মনে রেখে আমরা পালাবদল করে সাঁতার দিতে লাগলুম।

কিন্তু তাও আর কতক্ষণইবা সম্ভব? অল্পক্ষণের মধ্যেই এমনি অবসাদে ভরে গেলুম যে দেহের শেষ শক্তিবিন্দুটুকু পর্যন্ত হারিয়ে গেলো। হাত-পা সব অবশ, দৃষ্টি আচ্ছন্ন, মাথার ভিতর তাজ্ঝিম-মামি করছে, বোধহয় উদ্ধারের আর কোনো সম্ভাবনাই নেই—এমন সময়ে হঠাৎ একটা কঠিন জিনিশের গায়ে ধাক্কা খেলুম। আর অমনি কে যেন সবল হাতে আমাকে আঁকড়ে ধরে জলের উপর থেকে তুলে নিলে। তারপর আর-কিছু মনে নেই।

চেতনা ফিরে আসতেই দেখি দুটি উদ্বিগ্ন মুখ আমার উপর ঝুকে আছে-নেড ল্যাণ্ড আর কোনসাইল। তৎক্ষণাৎ ধড়মড় করে উঠে বসবার চেষ্টা করলুম। নেড ল্যাণ্ড! তুমি?

হ্যাঁ, প্রফেসর আরোনা, আমি। পুরস্কারের টাকার মায়াটা কিছুতেই ছাড়তে পারলুম না, তাই এবার একেবারে জানোয়ারটার পিঠেই চেপে বসেছি। অত জোরে হারপুন ছোড়া

সত্বেও নেড ল্যাণ্ডের হারপুন কেন ঠং করে লেগে ঠিকরে গিয়েছিল, তা এবার বুঝতে পারছি, প্রফেসর। কোনো হারপুন কি আর ইস্পাতের বর্ম ভেদ করতে পারে?

তার মানে?

তার মানে অত্যন্ত সরল, প্রফেসর। আপনি যার উপর বসে আছেন, সেটা যে আসলে অতিকঠিন একটি ধাতুনির্মিত খোল, তা আপনি হাত বুলিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবেন। আর যার পিছনে আমরা সর্বকর্ম ছেড়ে তেড়ে গিয়েছিলাম, সেটা আসলে তিমি নয়, তিমিজিলও নয়, অথবা অতিকায় ও অজ্ঞাত কোনো সিন্ধুদানও নয়, সেটা আসলে একটি–

ডুবোজাহাজ! বিমূঢ় আমি কলের পুতুলের মতো তার মুখে কথা জুগিয়ে দিলুম।

ঠিক তাই।

ততক্ষণে আস্তে পুবদিকে লাল ছোপ দিচ্ছে; গোল একটা আগুনের চাকার মতো টকটকে সূর্য উঠে আসছে সমুদ্রের জল থেকে। হঠাৎ এমন সময়ে পায়ের তলার বিশাল ভাসমান বস্তুটা নড়ে উঠলো। তারপরেই সেটা ডুবতে শুরু করলো আস্তে-আস্তে।

আমরা সবাই আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলুম। খ্যাপার মতো ডুবোজাহাজটার গায়ে পদাঘাত করতে করতে নেড ল্যাণ্ড প্রচণ্ড ও নিরর্থক চীৎকার শুরু করে দিলে।

হয়তো নেডের ওই চীৎকার একেবারেই নিরর্থক ছিলো না। কারণ আচমকা সেই বিচিত্র ডুবোজাহাজটি নিশ্চল হয়ে গেলো, তারপর ঢাকনি খুলে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো একটি লোক। কী-এক দুর্বোধ ভাষায় চেঁচিয়ে উঠেই সে আবার ভিতরে ঢুকে গেলো। তারপরেই পরপর উঠে এলো আটজন মুখোশ-পরা পুরুষ মূর্তি; আমরা কোনো কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমাদের টেনে হিচড়ে সেই ডুবোজাহাজের ভিতরে নিয়ে গেলো তারা।

কোথাকার জংলি, এরা?

অন্ধকারের মধ্যেই পায়ের তলায় একটা লোহার সিঁড়ি অনুভব করতে পারলুম। তারপরেই টাল সামলাতে না পেরে হুমড়ি খেয়ে পড়লুম ঘুটঘুটি অন্ধকার একটি ঘরে; শব্দ শুনে বোঝা গেলো মুহূর্তে পিছনের দরজা ঘটাং করে বন্ধ হয়ে গেলো।

বেশিক্ষণ কিন্তু অন্ধকারে থাকতে হলো না। খানিক পরে মাথার উপর একটি ফানুশের লণ্ঠনে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলে উঠলো, তারপর নিরেট ও মসৃণ দেয়ালের একটা অংশ দরজার মতো খুলে গেলো। একটু পরেই দুটি লোক ঘরে ঢুকলো।

তাদের মধ্যে একজন যে স্বয়ং নেতা, তা মুহূর্তেই বোঝা গেলো। অত্যন্ত ব্যক্তিত্বময় তার শরীর, যেন তা অস্বিতার প্রতিমূর্তি। শান্ত মুখের মধ্যে অদ্ভুত একটি দৃঢ়তার ছাপ রয়েছে, চোখের তারায় দুর্জয় সাহসের দীপ্তি। ঋজু তার ভঙ্গি, চলাফেরায় আভিজাত্যের স্বাক্ষর; মনে হয় বুঝি কোনো শেষ সম্রান্তের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালুম। পাণ্ডুর মুখবব, ঈষৎ বিষাদময়; দীর্ঘদেহী এই মানুষটিরও চওড়া কপাল আর কম্পমান আঙুল যেন কোনো গোপন আবেগের পরিচয় দেয়। স্বচ্ছ মর্মভেদী চোখে তিনি আমাদের দিকে তাকিয়ে রইলেন–যেন ওই দৃষ্টি দিয়েই তিনি আমাদের ভিতরটা তন্নতন্ন করে খুঁজে নিতে চাচ্ছেন।

ঘরের ভিতরকার থমথমে স্তব্ধতা আমিই ভাঙলুম। ফরাসী ভাষাতেই আমি আমাদের দুর্দশার কাহিনী বলে গেলুম। কোনো কথা না বলে তা তারা শুনে গেলো। সেই

অভিজাতমণ্ডিত মানুষটির চোখে মুখে আগ্রহ ও কৌতূহলের ছাপ দেখতে পেলুম, কিন্তু তবু কেন যেন মনে হলো আমার ভাষা বোধহয় তার দুর্বোধ ঠেকছে।

আমি তাতে মোটেই দমে গেলুম না। আমার অনুরোধে নেড সেই একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করলে ইংরেজিতে, তারপর কোনসাইল আলেমান ভাষায়। তখনও তাদের কোনো উচ্চবাচ্য করতে না দেখে শেষে ভাঙা-ভাঙা লাতিন ভাষারই শরণ নিলুম আমি। কিন্তু তারা তেমনি নির্বাকভাবে আমাদের লক্ষ্য করে গেলো কেবল। তারপর কি-এক অদ্ভূত ও অচেনা ভাষায় কথা বলতে বলতে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলো।

তারা চলে যেতেই নেড বিস্ফোরণের মতো ফেটে পড়লো। কোথাকার জংলি এরা যে পৃথিবীর কোনো সভ্য ভাষাই বোঝে না?

নেডের গজরানি শেষ হবার আগেই আবার দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো একটি পরিচারক। অন্যদের মতো এরও মাথায় সিন্ধু-ভোঁদড়ের ললামের টুপি, সীলমাছের চামড়ার জুতো, আর কোন অচেনা কাপড়ের পোশাক! হুবহু সেই রকমই কতকগুলি কুর্তা ও পাতলুন সে রাখলে আমাদের সামনে। পোশাকগুলো যে আমাদের জন্যই, তা সে না-বললেও বুঝতে পারলুম; তৎক্ষণাৎ আমরা ভিজে পোশাক ছেড়ে এই নতুন ও অদ্ভুত পোশাক পরে নিলুম।

এর মধ্যে পরিচারকটি টেবিলের উপর খাদ্যসম্ভার সাজিয়ে দিয়ে গেছে। চিনেমাটি আর রুপোর রেকাবিতে সারি সারি সাজানো সেসব খাবার দেখে নেড বলে উঠলো! শাবাশ!

এবার তাহলে কচ্ছপের যকৃৎ হাঙরের মুড়িঘন্ট আর কুকুর-মাছের ডিম ভাজা খেয়ে নিন—তাহলেই তো হয়।

কিন্তু নেডের এই গজরানির কোনো কারণ ছিলো না। খাবারের মধ্যে কয়েকটা কেবল অচেনা মাছ আছে। রুটি আর মদ না-থাকায় নেডের বিরক্তি চীৎকৃতভাবে প্রকাশ পেলো। আমার কিন্তু রান্নাটা সত্যি তোফা লাগলো। খাবার জলটাও বেশ টলটলে পরিষ্কার। ভোজবাড়ির খাওয়া হলো যেন আমাদের। আর ধাওয়ার পরেই চোখ ভরে ঘুম নেমে এলো। শুতে-না-শুতেই ঘুমিয়ে পড়লুম তিনজনে।

নটিলাস-এর ক্যাপ্টেন নেমো

কতক্ষণ যে ঘুমিয়েছিলুম আন্দাজ নেই। ঘুম ভাঙার পর দেখলুম নেড আর কোনসাইল তখন ঘুমে অচেতন। ঘরের ভিতরটা কেমন যেন গুমোট-মততা, নিশো নিতে কষ্ট হয়। কেমন করে যে এর। ঘরের মধ্যে অক্সিজেন সরবরাহ করে তা-ই ভাবছি, এমন সময় হঠাৎ এক ঝলক টাটকা সমুদ্রের হাওয়ায় মুহূর্তে ঘরের দমবন্ধকরা ভাবটা কেটে গেলো।

শুয়ে-ওয়ে কত অদ্ভুত ও বিচিত্র কথা ভাবছি, এমন সময়, নেঙ আর কোন সাইলেরও ঘুম ভেঙে গেলো। খুব খিদে পেয়েছিলো আমাদের। কিন্তু এই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটির অত্যদ্ভুত লোকগুলো আবার আমাদের খেতে দেবে কি না জানি না। নেড আর কোনাইল তোত খিদেয় রীতিমতো কাতর হয়ে পড়েছিলো। নেড তা ঘুম ভাঙার পর থেকেই ছটফট করছে, আর কোনসাইলও যথোচিত চেষ্টা সত্ত্বেও তার কাতর ভাবটা কিছুতেই গোপন রাখতে পারছে না। নানা প্রসঙ্গ উত্থাপন করে আমি ওদের ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা করতে লাগলুম। কিন্তু খিদের জ্বালায় নেড তখন উন্মত্তপ্রায়; ঘরময় দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে সে, ক্রমাগত লাথি মারছে সেই দেয়ালে, আর সমানে চীৎকার করে ডুবোজাহাজের প্রত্যেকটা আরোহীকে গোল্লায় পাঠাচ্ছে। শেষটায় ওর রকমশকম আমাকে রীতিমতো আতঙ্কিত করে তুললো।

আমার এই আশঙ্কা যে মোটেই অমূলক নয়, একটু পরেই তা টের পাওয়া গেলো। কিছুক্ষণ পরে ঘরের দরজা খুলে একটি পরিচারক ঢুকতেই নেড আচমকা তার উপর খ্যাপা নেকড়ের মতো লাফিয়ে পড়লো। অমন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে পরিচারকটি একটা পাক

খেয়েই মেঝেয় ছিটকে পড়লো। অমনি লেড তার বুকের উপর চেপে বসে টুটি টিপে ধরলো। কেলেঙ্কারি হয় দেখে আমি আর কোনসাইল নেড়কে টেনে তোলার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি, এমন সময় পিছন থেকে কে যেন পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ ফরাশিতে বলে উঠলো। শান্ত হও, মিস্টার ল্যাণ্ড। প্রফেসর দয়া করে আমার কয়েকটি কথা শুনবেন কি আপনি?

বক্তা আর-কেউ নন–সেই অভিজাত পুরুষ, যাকে দেখেই আমার দলপতি বলে বোধ হয়েছিলো।

নেড তো এ-কথা শুনেই লাফিয়ে উঠলো। তাকিয়ে দ্যাখে টেবিলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি, বুকের উপর হাত দুটি আড়াআড়িভাবে ভাজ করা, সমস্ত ভঙ্গিমাটির মধ্যে কর্তৃত্বের ছাপ।

বিস্মিত আমার তখন স্তব্ধতা ভেঙে কথা বলার ক্ষমতা ছিলো না। তিনিই আবার বিশুদ্ধ ফরাশিতে বলতে লাগলেন, আমি ফরাশি, আলেমান, ইংরেজি ও লাতিন ভাষা বলতে পারি। কিন্তু তখন আমি কথা বলিনি এই জন্যেই যে আমি বুঝতে পারছিলাম না আপনারা সত্যি কথা বলছেন কিনা। পরে যখন দেখলুম চার ভাষায় বলা চারটে গল্পই এক, তখন বুঝলুম আপনারা মিথ্যে বলেননি। আমি ততা আর পৃথিবীর বাসিন্দা নই, আপনাদের ওই জগৎ থেকে নিজেকে আমি সম্পূর্ণ সরিয়ে এনেছি এই জলের তলায়, তবুও আপনারা এসেছেন আমাকে উত্ত্যক্ত করতে...

আমরা কিন্তু স্বেচ্ছায় আসি নি।

এই-যে আব্রাহাম লিঙ্কন হন্যে হয়ে সাত সমুদ্রে আমাকে খুঁজে বেড়িয়েছে সে কি আপনাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও? আমার জাহাজ লক্ষ্য করে যে কামান ছোড়া হয়েছে, তা কি অনিচ্ছার সাক্ষী? নেড ল্যাণ্ড যে এই জাহাজ লক্ষ্য করে হারপুন ছুঁড়েছিলো তাও কি তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে? রোষে তাঁর গলা গমগম করে ওঠে। স্পষ্ট গম্ভীর স্বরে তিনি বলতে থাকেন, যাক, এ সম্বন্ধে আমি কোনো বাদ-প্রতিবাদ করতে চাই নে। আপনারা এখন যুদ্ধবন্দী। নেহাত দয়া করে আপনাদের আমি সলিলসমাধি থেকে বাঁচিয়েছি। নয়তো আমার জাহাজ জলের তলায় নিয়ে গিয়ে আপনাদের অকুল সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে মেরে ফেলাই কি আমার উচিত ছিলো না?

তাহলে সেটা বর্বরোচিত হতো, কেননা কোনো সভ্যমানুষ এমন পাষাণ হতে পারে না, আমি বললুম।

প্রফেসর, তাঁর গলার স্বর তীব্র হয়ে উঠলো, আপনারা যাকে সভ্য বলেন, আমি তা নই। ওই তথাকথিত সভ্যতার আগাপাশতলা দেখেছি আমি, জানি তার হামবড়া বুলি ও নৃশংস ক্রিয়াকলাপের অর্থ কী। আমাদের ওই সভ্যজগতের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছি আমি, আপনাদের কোনো নিয়মকানুনই আমি মানি না। আপনাকে আমি স্পষ্ট করে জানিয়ে দিচ্ছি, প্রফেসর, ভবিষ্যতে কখনো ওই সভ্যজগতের নজির আমার কাছে তুলবেন না।

প্রচণ্ড রোষে তার চোখ ঝকঝক করে উঠলো। সেই গম্ভীর গমগমে গাল শুনে বুঝতে পারলুম, নিশ্চয় এই মানুষটির জীবনে কোনো ভীষণ ইতিহাস লুকিয়ে আছে। তথাকথিত আইনকানুন তিনি মানেন না; সিন্ধুতলের কোনো গভীর আইনের বাধানিষেধও তাঁকে

শাসন করতে অক্ষম। বোধহয় একমাত্র বিবেক, আর ঈশ্বর ছাড়া আর-কারো সংহিতাকেই তিনি গ্রাহ্য করেন না।

এই জাহাজে আপনাদের স্থান দিতে পারি কেবল কয়েকটি শর্তে, আবার কঠিন স্বরে বললেন তিনি, মাঝে-মাঝে এমন-সব ঘটনা ঘটবে আপনাদের দেখতে দেয়া হবে না। তখন আপনাদের আমি এই ঘরে বন্দী করে রাখবে। আর, জীবদ্দশায় আপনারা আর সভ্যজগতে ফিরে যেতে পারবেন না।

অর্থাৎ আমরা বন্দী হয়েই থাকবো?

এক অর্থে তা-ই। কিন্তু প্রায় সব ক্ষেত্রেই আপনারা আমার মতোই এখানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারবেন।

তার মানে, জেলখানায় কোনো বন্দী ইচ্ছে করলে যেমনভাবে পায়চারি করতে পারে, আমাদেরও কেবল সেই অধিকারটুকু থাকবে?

সমস্ত স্বাচ্ছন্দ্যের অর্থ আপনি যদি তা-ই করেন, তাহলে আমি কোনো প্রতিবাদ করতে চাই না। তবে আপনাদের আমি কখনোই পৃথিবীতে ফিরে যেতে দেবো না, কেননা আপনারা আমার গোপন অস্তিত্বের কথা জেনে গেছেন, আসলে আপনাদের এখানে রেখে আমি নিজেকেই রক্ষা করার চেষ্টা করছি।

অর্থাৎ আপনার শর্ত মেনে না নিলে আমাদের মৃত্যুবরণ করতে হবে।

অগত্যা।

এ-কথার কোনো উত্তর নেই। তবে এই জাহাজের নেতার কাছে আমরা কোনোকথার সূত্রে বদ্ধ নই।

না, তা নন। তারপর মানুষটি অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরে বললেন, মঁসিয় আরোনা, আপনার অন্তত এই প্রস্তাবে আপত্তি করার কিছু থাকতে পারে না। সমুদ্রের রহস্য সম্বন্ধে আপনি একাধিক বই লিখে থাকলেও আপনার জ্ঞান ও নানা অনুমান মূলত অসম্পূর্ণ। এই জাহাজে থাকলে আপনি সেই অজ্ঞাত জগৎ দেখার সুযোগ পাবেন, যার রহস্য বস্তুত এত কাল কেবল অনুমাননির্ভর ছিলো। আমাকে আপনার ধন্যবাদ দেয়া উচিত, কারণ আমার জন্যেই সিন্ধুতলের বিপুল রহস্য ভেদ করার সুযোগ পাবেন আপনি।

প্রকৃতিবিজ্ঞানের উল্লেখ যে আমাকে দুর্বল করে ফেললো, একথা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই; মুহূর্তের জন্য এ-কথা ভুলে গেলুম যে স্বাধীনতার বিনিময়ে আমার বৈজ্ঞানিক কৌতূহল চরিতার্থ করার কোনো অর্থ হয় না। আস্তে তাকে জিগেস করলুম, আপনাকে কী বলে সম্বাোধন করবো আমি।

কাপ্তেন নেমে.. আপনি আর আপনার সঙ্গীরা আমার কাছে নটিলাস জাহাজের যাত্রী ছাড়া আর-কেউ নন। তারপর নেড আর কোনসাইলের দিকে ফিরে বললেন, এখানে, এই কেবিনেই—আপনাদের খাবার দেয়া হয়েছে। এই পরিচারকটি আপনাদের দেখাশুনো করবে।...আর মঁসিয় আরোনা, আমাদের ছোটোহারি প্রস্তুত। আসুন, আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই।

দীর্ঘ করিডর পেরিয়ে আমাকে নিয়ে তার বাবার-ঘরে এলেন কাপেন নেমো। বিলাসবহুল মূল্যবান আশবাবপত্রে সাজানো কেবিনগুলো দেখে রীতিমতো তাজ্জব হয়ে যেতে হয়। যেন জলের তলায় নতুন এক অমূল্য জগতের উপর থেকে পর্দা

উঠে গেলো।

বিস্তর বাবার সাজানো ছিলো টেবিলের উপর, কিন্তু সবই আমার অচেনা। আমার চোখমুখে কৌতূহলের ছাপ ফুটে উঠতে দেখে কাপ্তেন নেমো বললেন, বেশির ভাগ খাবারই আপনার অচেনা ঠেকবে, মঁসিয় আরোনা। কারণ যা-কিছু দেখছেন, সবই সিন্ধুতলের অবদান। পৃথিবীতে আপনারা যে-খাদ্য গ্রহণ করেন, বহুশি হলো আমি তা ত্যাগ করেছি, কিন্তু এই খেয়েই বেশ সুস্থ ও শক্ত আছি–কোনো অস্বাচ্ছন্দ্যই বোধ করি না।

এইসব খাবারই তবে সমুদ্রের দান?

হ্যাঁ, প্রফেসর। সমুদ্রই আমার যাবতীয় চাহিদা মেটায়। কখনো জাল ফেলে সব জোটাই আমি, কখনো দলবল নিয়ে জলের তলায় বেরোই শিকারে। ওটা কচ্ছপের মাংস ভাজা, আর এটা শুশুকের যকৃৎ-খেতে অনেকটা শুয়োরের মাংসের মতো লাগবে। আর এটা হলো তিমিমাছের দুধ থেকেতৈরি পনির। চিনি বানিয়েছি উত্তর সাগরের সমুদ্রের শালা থেকে। কাপ্তেন নেমো বলতে থাকেন, প্রফেসর, সমুদ্র কেবল আমাকে আহার্যই জোগায় না, বসনভূষণও দেয়। আপনি তো জানেন ঝিনুক শামুক গুগলি প্রভৃতি কতগুলো সামুদ্রিক প্রাণী এক ধরনের সূক্ষ্ম রেশমের মতো তন্তু দিয়ে নিজেদের বেঁধে রাখে—এই

আঁশকে বলে বাইসাস। আপনি যে-পোশাক পরে আছেন, তা এই বাইসাস থেকে তৈরি। ভূমধ্যসাগরের কয়েকটি কঠিন বর্ম প্রাণীর দেহের রঙে এই পোশাক রঙ করা হয়েছে। আপনার শয্যায় পাতা আছে সমুদ্রের সবচেয়ে পরম ঘাস। লেখার জন্য পাবেন তিমিমাছের হাড়ের কলম, আর যে কালি দিয়ে আপনি লিখবেন তা কালামারির দেহনিংড়োনো কৃষ্ণবর্ণ তরল পদার্থ।

সমুদ্রকে আপনি ভালোবাসেন, কাপ্তেন?

বাসি। সমুদ্রই আমার সব, সর্বস্ব। তার হাওয়া শুদ্ধ, স্বাস্থ্যময়। সমুদ্র হচ্ছে বিপুল একটা মরুভূমির মত, যেখানে মানুষ কখনোই একা বোধ করে না, কারণ তার চারপাশে সে অনুভব করে প্রাণের স্পন্দন–এক অনিঃশেষ প্রাণস্রোত সেখানে অনন্ত বহমান। সমুদ্রে স্বৈরাচারীর স্থান নেই-তারা হানাহানি করে মরে ডাঙায়, জলের উপরে; ত্রিশ বা নিচে তাদের কোনো ক্ষমতাই নেই। প্রফেসর, জলের মধ্যে থাকুন দেখবেন স্বাধীনতা কেবল এই সিন্ধুতলেই আছে। এই সিন্ধুতলে কোনো স্বৈরাচারী প্রভু নেই, সেখানেই আমি আমার স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারি, সেখানেই আমি স্বাধীন, আত্মপ্রভু! কথা বলতে বলতে প্রবল আবেগে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কাপ্তেন নেমো; উত্তেজিতভাবে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগলেন তিনি। কিন্তু একটু পরেই আবার নিজেকে তিনি সামলে নিলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন মসিম আয়োনা, চলুন—আপনাকে–আমার নটিলাস ঘুরিয়ে দেখাই।

রাজা ও সন্ন্যাসী

কাপ্তেন নেমে আমাকে কী দেখিয়েছিলেন নটিলাস-এ? সব-কিছু। হয় এই ছোট্ট উত্তরটিতে পাঠকদের সন্তুষ্ট থাকতে হবে, আর নয়তো এ-তথ্যটা মনে রাখতে হবে যে পাতার পর পাতা জুড়ে লিখলেও এই বিচিত্র ডুবোজাহাজটির ভিতরকার স্বয়ম্পূর্ণ পৃথিবীর বর্ণনা কিছুতেই সম্পূর্ণ হবে না। দেখেছিলুম মস্ত গ্রন্থাগার-সব ভাষার সব রুচির বই সাজানো আছে থরেথরে, তবে সংখ্যায় বিজ্ঞানের বই-ই বেশি; দর্শন, পুরাণ, কাব্য, সাহিত্য, ইতিহাস-এদেরও তাই বলে অবহেলা করা হয়নি। দেখেছিলুম এমন এক বিচিত্রভবন বা সংগ্রহশালা, সারা ইমোরোপে যার কোনো তুলনা মিলবে না, যা এমনকী কল্পনাকেও অনায়াসে ছাড়িয়ে যায়। যাবতীয় দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য বস্তু তো আছেই, তাছাড়াও ছিলো এমন অনেক বস্তু, যার সন্ধান পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞানীই এখনো পায়নি। আর দেখেছিলুম রত্নশালা–যেখানে নানা রঙের নানা আকারের ছোটো-বড়ো অসংখ্য মূল্যবান মুক্তো জমিয়ে রাখা হয়েছে।

এই সংগ্রহের পিছনে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়েছে, তার সামান্য একভাগও সাত রাজাকে ফতুর করে দিতে পারে। অথচ এই অসীম ধনবান মানুষটির শয়নকক্ষ আমাকে আশ্চর্য করেছিলো সবচেয়ে বেশি। এ যেন কোনো সন্ন্যাসীর ঘর–নিরাবরণ ও নিরাভরণ; একটা লোহার খাট, একটা ছোট্ট টেবিল, আর হাত খোবার একটা বেসিন ছাড়া আর কিছুই নেই। এই অতুল ঐশ্বর্যের পাশেই এই সুকঠোর তপশ্চর্যা তাঁর সম্বন্ধে কি রকম যেন দুর্বল করে ফেললে আমাকে।

তারপরে এই বিদ্রোহী মানুষটি আমাকে নটিলাস-এর সব যন্ত্রপাতি বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। নাবিকরা যেসব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তার কোনোটা তার সংগ্রহ থেকে বাদ যায়নি।

নটিলাস-এর যে-দানবিক শক্তি সাত সমুদ্রকে কাঁপিয়ে তুলেছে, তার মূল হলো বিদ্যুৎ। সমুদ্রজল থেকে সোডিয়াম নিষ্কাশন করে অত্যন্ত অনায়াসে ও শস্তায় অফুরন্ত বিদ্যুৎ শক্তি বানিয়ে নেয় নটিলাস। তার প্রচণ্ড গতিবেগ, আলো আর উত্তাপের উৎসই হচ্ছে এই অফুরান বিদ্যুতের ভাণ্ডার–সিন্ধুতল। শক্তিশালী পাম্প দিয়ে বাতাস-ঘরে প্রচুর ধন-বাতাস জমিয়ে রাখতেন কাপ্তেন নেমো, যাতে জলের তলায় একটানা অনেকদিন থাকতে হলেও কোন অসুবিধে না-হয়। বিদ্যুৎচালিত ধড়ি, জাহাজের গতিমাপক স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র, জলস্তরের তাপমাত্রা মাপবার তাপমান যন্ত্র, বহু অতিরিক্ত গীয়ার প্রভৃতি নানাবিধ জিনিশ তিনি এক এক করে দেখালেন আমাকে।

নটিলাস-এর ঠিক মাঝখানে একটা কুয়োর মতো খাড়া সুরঙ্গ দেখতে পেলাম। কুয়োর উপরে ঘোরানো-সিঁড়ি উঠে গেছে। এটা যে কী, বা কেন এটা আছেকিছুই আমি বুঝতে পারছিলুম না। আমার কৌতূহলী চাহনি দেখে কাপ্তেন নেমো জানালেন, উপরে আমার নৌকো আছে প্রফেসর।

তাই নাকি? কিন্তু নৌকোয় চড়তে হলে নিশ্চয় নটিলাসকে জলের উপর নিয়ে যেতে হয়।

মোটেই না। নৌকোর উপরে-নিচে দুটি ঢাকনি আছে। নিচেরটা বন্ধ করে বাঁধন খুলে দিলেই, ছিপির মতো, নৌকো জলের উপর ভেসে ওঠে। তারপর পাটাতনের উপরকার ঢাকনি খুলে মাস্তুল লাগিয়ে পাল তুলে দাঁড় টানলেই হলো।

কিন্তু ফিরে আসেন কী করে?

আমি আসি না, বরং নটিলাসই আমার কাছে যায়। বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে বার্তা পাঠালেই জাহাজ চলে যায় আমার কাছে।

নটিলাস-এর আরেক দিকে গিয়ে সমুদ্রের নোজল পরিশ্রুত করে টলটলে পানীয় জল তৈরি করার ব্যবস্থা দেখলুম। ইঞ্জিন-ঘরটা ছিলো সবচেয়ে পিছনে। এখান থেকেই প্রচণ্ড বেগ লাভ করে নটিলাস-এর প্রপেলার ঘুরিয়ে ঘণ্টায় এমনকী পঁয়তাল্লিশ নট বেগেও জাহাজ চালানো যায়।

সব দেখে-শুনে আমরা আবার গ্যালারি-ঘরে ফিরে এলুম। একটি সোফায় বসতে বসতে বললুম, কাপ্তেন নেমো, সবই দেখতে পেলুম, কিন্তু এখনো অনেক তথ্য আমার কাছে গোপন ও রহস্যময় থেকে গেলো।

আমার দিকে একটি সিগার বাড়িয়ে দিলেন কাপ্তেন নেমো। নিন, আপনি নিশ্চয়ই ধূমপান করেন।

সে কি! আপনারা এখানে চুরুটও খান নাকি?

নিশ্চয়ই!

তাহলে এখনো নিশ্চয়ই হ্যাভানার সঙ্গে সম্পর্ক রেখেছেন আপনি?

না, তা রাখি নি। চুরুটটা যদিও হ্যাভার নয়, তবু তা আপনার ভালো লাগবে বলে আশা করি।

সোনালি রঙের চুরুট জ্বালিয়ে বুক ভরে ধোয়া নিলুম আমি। চমৎকার চুরুট। কিন্তু তামাক আছে বলে তো মনে হয় না।

না। এই তামাক হ্যাভানারও নয়, ব্রহ্মদেশেরও নয়। আসলে এটা সমুদ্রেরই একরকম শ্যাওলা-নিকোটিনে ভতি। অবশ্য এই শ্যাওলা খুব-যে বেশি পরিমাণে পাওয়া যায়, তা নয়। আপনার যদি এই চুরুট ভালো লেগে থাকে, তাহলে আপনি যত-ইচ্ছে তা খেতে পারেন।

চুরুট খেতে-খেতেই আমি আবার বললুম, নটিলাস-এর রহস্য এখনো আমার

কাছে গোপন থেকে গেলো, ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন নেমো আমার দিকে গভীর চোখে তাকিয়ে বললেন, কোনো রহস্যই আপনার গোপন থাকবে না, মঁসিয় আরেনা; সবই আপনাকে খুলে বলবে, কারণ নটিলাস থেকে আমার এই গোশল বর নিয়ে কোনোদিনই আব সভ্যশতে ফিরে যেতে পারতেন না আপনি।

একটু থেমে তিনি সব বিশদ করলেন, মঁসিয় আবোনা, নটিলাস-এর দৈর্ঘ্য পঁচাত্তর গজ। পুরো জাহাজটা দু-দুটো ইস্পাতের খোলে মোড়া আছে, একটা ইস্পাতের পাতের উপর আরেকটা ইস্পাতের পাত বসানো বলে যে-কোনো ভীষণ আঘাতও অনায়াসে প্রতিহত ও

উপেক্ষা করতে পারে নটিলাস। জাহাজের ভিতরে মস্ত কয়েকটা ট্যাঙ্ক আছে–ডুব দেবার সময় পাম্প করে ওই জলাধারগুলো শুরে নিই। কখনো খুব গভীরে নামতে হলে নটিলাস অবশ্য হাইড্রোপ্লেনের সাহায্যে কোণাকুণিভাবে জল কেটে নামতে পারে।

কিন্তু জলের তলায় চালক পথ দেখযে কেমন করে? সিন্ধুতলে তো আর সূর্য ওঠে না।

মস্ত একটা ঘুলঘুলি বসানো স্তম্ভের মধ্যে চালক আর হুইল থাকে— দেয়ালের গায়ে আবার টেলিস্কোপও বসানো আছে। দু-পাশ থেকে তীব্র বিদ্যুতের আলোয় সমুদ্রের জল দিনের মতো ঝলমল করতে থাকে।

ও, তাহলে এই আলোকেই আমরা সিন্ধুদানবের গা থেকে ছড়িয়ে-পড়া ফসফরাসের দীপ্তি বলে মনে করেছিলুম। কিন্তু স্কটিয়া জাহাজকে আপনি খামকা হঠাৎ জখম করতে গেলেন কেন?

সেদিন নটিলাস মাত্র এক বাও তলা দিয়ে যাচ্ছিলো। তাহতেই হঠাৎ স্কটিয়ার খোলে ধাক্কা লেগে যায়।

আর অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন?

মঁসিয় আরোনা, এটা ভুলে যাবেন না যে অ্যাব্রাহাম লিঙ্কন আমাকে আক্রমণ করেছিলো, তাই আত্মরক্ষার জন্যই আপনাদের জাহাজকে কেবল বিকল করে দিয়েছিলুম, ডুবিয়ে দিই নি।

আমি তক্ষুনি প্রসঙ্গ পাল্টে ফেললুম। তাছাড়া নটিলাস-এর সম্বন্ধে আমার শ্রদ্ধা ও বিস্ময় তখন অমীমে পৌঁছেছিলো। জিগেস করলুম, আচ্ছা, এত বড়ো জাহাজটা এত গোপনে আপনি তৈরি করলেন কোথায় যে কাকপক্ষীও তার কথা টের পেল না?

একটা নির্জন দ্বীপে। টুকরো-টুকরো অংশগুলো আমি এক জায়গায় কিনি নি–তাহলে লোকের সন্দেহ হতে পারতো। নানা দেশ থেকে নানা অংশ আনিয়েছিনু আমি–খোলটা এসেছে ফ্রান্স থেকে, লণ্ডন থেকে চাকার রড, লিভারপুল থেকে ইস্পাতের বর্ম, গ্লাসগো থেকে আস্ত চাকাটা, ট্যাঙ্কগুলো বানিয়েছিলাম পারীতে, জার্মানিতে ইঞ্জিন, সুইডেনে সামনের অংশটা, আর নিউইয়র্কে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতিগুলো। প্রত্যেকটা কারখানায় ভিন্ন-ভিন্ন নামে নক্সা আর বড়া পাঠিয়েছিলুম। তারপর একটা নির্জন দ্বীপে সব জুড়ে দিয়ে তৈরি হলো নটিলাস! তারপর নটিলাস নিয়ে অকুল পাথারে ভেসে-পড়ার আগে আগুন দিয়ে সবকিছু একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলুম, যাতে কোনোদিন আপনাদের সভ্যজগৎ এরকিছু টের না-পায়।

আপনার ঐশ্বর্যের নিশ্চয়ই সীমা নেই–

সত্যি সীমা নেই, প্রফেসর। ফরাশিদের জাতীয়-ঋণ আমি অনায়াসে নিজের একটুও অসুবিধে না-করে–মিটিয়ে দিতে পারি।

ক্যাপ্টেন নেমো কথাটা এমন নির্বিকারভাবে বললেন যে আমি একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলুম। তিনি কি তাহলে আমাকে উজবুক বানাতে চাচ্ছেন?

অতল জলের পথিক

এবার, প্রফেসর, ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, আমাদের সমুদ্র যাত্রা শুরু হবে; আবার একবার আস্ত পৃথিবী ঘুরে আসবে নটিলাস সমুদ্রের তলা দিয়ে। আমাকে গিয়ে যাত্রার ব্যবস্থা করতে হয়। এখন আমরা পারীর মধ্যরেখার ৩৭°১৫’ পশ্চিম দ্রাঘিমা আর ৩০° অক্ষরেখায় আছি। এখান থেকেই আজ নভেম্বরের আট তারিখে দ্বিপ্রহরে আমাদের সমুদ্রতল অভিযান শুরু হবে। আসলে আমরা এখন জাপানের উপকূল থেকে তিনশো মাইল দূরে রয়েছি। আপনি বরং এখানেই বসুন, আমি ইঞ্জিনঘর থেকে ঘুরে আসি।

ক্যাপ্টেন নেমো চলে গেলেন। আমি একা বসেবসে এই রহস্যময় মানুষটির কথা ভাবতে-ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়লুম। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে অতীতের স্মৃতি তার পক্ষে অত্যন্ত বেদনাময়; তাঁর আর্ত পাণ্ডুর মুখচ্ছবিতে বিষণ্ণ অথচ উজ্জ্বল চোখ দুটি যেন অত্যন্ত সযত্নে কোনো দূর দিনকে লুকিয়ে রাখতে চাচ্ছে। মানুষটি স্বাধীনচেতা; যতক্ষণ কথা হলো ততক্ষণই কেবল স্বাধীনতার কথা উল্লেখ করেছেন বারেবারে। তবে কি তিনি কোনো পরাধীন দেশের মানুষ? কোন দেশের মানুষ তিনি আসলে? কেন তিনি পৃথিবীকে এমন ঘৃণা করেন? কেন এই মানবজাতি সম্বন্ধে তার অবজ্ঞা ও ঘৃণার শেষ নেই? কেন তার গলার স্বর মাঝে মাঝে অমন তীব্র ও ভীষণ হয়ে ওঠে?

কতক্ষণ ধরে যে এসব কথা ভাবছিলুম বলতে পারবো না। হঠাৎ অন্যমনস্ক ভাবে চোখ গিয়ে পড়লো টেবিলের উপরকার মস্ত ভূগোলকটার উপর। তারপর ভালো করে তাকিয়ে

আঙুল রেখে দেখলুম আমরা কোনখানে রয়েছি–কোনথানে ওই দ্রাঘিমা আর অক্ষরেখা পরস্পরকে ছেদ করেছে।

ডাঙায় যেমন নদী থাকে, তেমনি থাকে সিন্ধুতলেও। তাপমাত্রা আর বর্ণলেপের তারতম্য থেকেই এই বিশেষ স্রোতগুলোকে শনাক্ত করতে হয়। এদের ভিতর সবচেয়ে বিখ্যাত হলো গালফ স্ট্রিম এই স্রোত ধরেই আমরা এখন ছুটে চলেছি। নিপ্পনীরা এই সিন্ধু-নদীকে বলে কুররা-শিভো অর্থাৎ কালো নদী। বঙ্গোপসাগর থেকে বেরিয়ে এই স্রোত মালাক্কা প্রণালী অতিক্রম করে এশিয়ার উপকূল ধরে এগোতে-এগোতে একেবারে উত্তর-প্রশান্ত মহাসাগরে এসে পড়ে। এই সামুদ্রিক স্রেতটির রঙ এত গাঢ়-নীল যে প্রায় কালো বলেই বোধ হয়। আর এই স্রোত যে শুধু কালো তা-ই নয়, বেশ উষ্ণও বটে। ভূগোলকটির উপর আঙুল রেখে এই কালো নদীর গতিপথ দেখছি এমন সময়ে ঘরে ঢুকলো নেড আর কোনসাইল।

সংগ্রহশালাটি দেখেই দুজনে বিস্ময়ে হতবাক। কিন্তু নেড ল্যাণ্ড ডাকাবুকো একবোখা লোক; তা-দেখে সহজে ভুলবে কেন? কী করে এই নটিলাস নামক জেলখানা থেকে পালানো যায়, সেই চিন্তাই তখন তার কাছে একমাত্র চিন্তা। কথাবার্তার মধ্যেও বারেবারে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সেই প্রসঙ্গই উত্থাপন করছে।

এমন সময় হঠাৎ সব অন্ধকার হয়ে গেলো। নেডল্যাণ্ড কী-একটা কথা বলতে চাচ্ছিলো, কিন্তু হঠাৎ এই গভীর অন্ধকার নেমে এলো বলে তার মুখের কথা মুখেই রয়ে গেলো। কী যে করবো কিছুই বুঝতে পারছিলুম না। এই অন্ধকার কি কোনো ভীষণ অমঙ্গলের সংকেত, না কি নটিলাস-এর যাত্রার সুচনা-তা আমাদের কাছে স্পষ্ট ছিলো না। শুধু

একটা ঘড়ঘড়ে শব্দ ছাড়া আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। নেড ল্যাণ্ড শুধু বললে, এবার সব শেষ!

আচমকা সেলুনের দু-পাশে দুটি আয়তাকার কাচের মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল আলো দেখা দিলো। অমনি সিন্ধুতল ঝলমলে হয়ে উঠলো, ওই পুরু কাচ ছাড়া। আমাদের সঙ্গে সমুদ্রের আর কোনো ব্যবধান রইলো না।

এই কাচের ওপাশে যে-অপরূপ দৃশ্য ফুটে উঠলো, তা কোনোদিনই ভোলবার নয়। প্রকৃতির হাতে গড়া এক বিপুল জলাধারে আলো এসে পড়লো, আর উদঘাটিত করে দিলো এক বিস্ময়কর দৃশ্য, যেখানে প্রাণের স্রোত বয়ে চলেছে অবিশ্রাম, যেখানে সবুজ শ্যাওলার ফাকে ফাকে স্বচ্ছল ও স্বাধীন মাছেরা খেলা করে বেড়াচ্ছে—কত বিভিন্ন জাতের, বিভিন্ন রূপের, বিভিন্ন আকারের মাছ। আলোর রেখা যেন তাদের টান দিয়েছিলো। তাই আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসেছিলো অগুন্তি মাছের ঝাঁক। যেন কোনো তৃতীয় নয়ন চোখের সামনে থেকে কোনো-এক বিশ্রী পর্দা তুলে দিয়ে আশ্চর্যকে উন্মোচন করে দিল। আমি যখন মুগ্ধ বিস্ময়ে এই আশ্চর্য দৃশ্যে তন্ময় হয়ে আছি, নেড কিন্তু তখন এই মৎস্যকুলের মধ্যে কোনটা সুখাদ্য এবং কোনটা অখাদ্য তা-ই নিয়ে মহা-সমস্যায় পড়েছে।

প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে এই আশ্চর্য মৎস্যবাহিনীকে দেখে গেলুম আমি। চেনাঅচেনা মাছের বাহিনী নটিলাস-এর আলোর রেখা ধরে ছুটে এলো তার পিছনপিছন : ম্যাকারেল, স্যালাম্যাণ্ডার, সারমুলেট, সিন্ধুসাপ—কত কি। তারপর হঠাৎ সেই পুরু কঁচের জানলা বন্ধ হয়ে গেলো, আর সেলুনের মধ্যে উজ্জ্বল আলো জ্বলে উঠলো। সে অপরূপ দৃশ্য হারিয়ে

গেলো মুহূর্তে। কিন্তু অনেক পরেও আমার ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে হানা দিলো সেই সব উজ্জ্বল মসৃণ বিকট-সুন্দর মৎস্যবাহিনী-সমুদ্রের সেই স্পন্দমান বাসিন্দারা, নটিলাস-এর কাচের জানলা দুটি কোনো তৃতীয়-নয়নের মতো হয়ে আমার সামনে যাদের চাঞ্চল্য, স্পন্দন ও খেলা উন্মোচিত করে দিয়েছিলো।

সিন্ধুতলের মৃগয়া

পর-পর সাতদিন ক্যাপ্টেন নেমোর কোনো পাত্তাই পাওয়া গেলো না। একবারও তার সঙ্গে দেখা হলো না আমাদের, কোনো কথা হলো না; একা-একা ঘুরে বেড়ালুম তাঁর গ্রন্থাগারে ও সংগ্রহশালায়; আর নটিলাস ছুটে চললো সেই সিন্ধুতলের চঞ্চল স্রোতের মধ্য দিয়ে তার নির্দিষ্ট পথ ধরে।

ক্যাপ্টেন নেমোর কোনো দেখা না-পেয়ে নেড আর কোনসাইল বেশ বিচলিত হয়ে পড়লো। তাহলে এই আশ্চর্য মানুষটি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন? না কি আমাদের সম্বন্ধে তার মত আর সিদ্ধান্ত পরিবর্তিত হয়েছে? আমার মনে হলো হঠাৎ আড়ালে চলে যাওয়াটাও বুঝি তার রহস্যময় স্বভাবের একটা বিশেষ দিক–নিজের চারপাশে কোনো দেওয়াল তুলে দিতেই তিনি বুঝি ভালোবাসেন। জানি না কেন এই মানুষটি আমার সমস্ত চেতনাকে যেন নাড়িয়ে দিয়েছেন।

হঠাৎ ষোলোই নভেম্বর আমার কামরায় টেবিলের উপর তার একটি চিরকুট পেলুম। অনেকটা আলেমান হরফের ধরনে লেখা চিঠিটা, গথিকভঙ্গির হস্তলিপি। চিরকুটে লেখা :

অধ্যাপক আরোনা সমীপেষু, নটিলাস জাহাজ।

ক্রেসপো অ্যাইল্যাণ্ডের জঙ্গলে আগামী কাল প্রাতঃকালে ক্যাপ্টেন নেমে শিকারে যাবেন বলে স্থির করেছেন। এই মৃগয়ায় তিনি অধ্যাপক আরোনা ও তাঁর সঙ্গীদের সাহচর্য পেলে অত্যন্ত আনন্দিত বোধ করবেন।

নেড আর কোনসাইল তো এই আমন্ত্রণ পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলো। অনেক দিন পরে পায়ের তলায় শক্ত মাটি পাওয়া যাবে-এটা কি কম আনন্দের কথা!

কিন্তু তাদের এই আনন্দ পরের দিনই মিলিয়ে গেলো, যখন পরদিন সকালে ছোটোহাজরির সময় খাবার-টেবিলে ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হলো তখন স্পষ্ট করে জানা গেলো, আমরা ক্রেসপো অ্যাইল্যাণ্ডে যাচ্ছি বটে, কিন্তু তা দ্বীপের উপরে নয়, নিচে জলের তলায়। সিন্ধুতলের সেই সুন্দর বনের অধীশ্বর ক্যাপ্টেন নেমো; সেখানেই আমরা বন্দুক নিয়ে পায়ে হেঁটে শিকারে বেরোবে।

জলের তলায়? পায়ে হেঁটে শিকার? বন্দুক নিয়ে? আমার বিস্ময় অস্ফুট কতগুলি কথায় মুখর হয়ে উঠলো।

প্রফেসর, আপনি ভাবছেন যে লোকটা বুঝি পাগল, তাই না? তা যদি ভেবে থাকেন তাহলে আপনি আমার সম্বন্ধে ভুল ভেবেছেন। আমার মতো আপনিও নিশ্চয়ই জানেন যে জলের তলাতেও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে যদি সে নিজের সঙ্গে স্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যথেষ্ট পরিমাণ হাওয়া নিয়ে যেতে পারে। আমাদের সঙ্গে প্রচুর হাওয়া থাকবে সিলিণ্ডারের মধ্যে সংমিত বাতাস নিয়ে যাবে আমরা। রাসায়নিক প্রক্রিয় এই বাতাস তৈরি হবে, একটা বিশেষ ধরনের হুঁকনি দিয়ে হেঁকে এই ঘন বাতাসকেই হালকা করা হবে, এবং তাই আপনার নাকে পৌঁছোবে। মাথাটা ঢাকা থাকবে ডুবুরিদের মতো পিতলের বর্তুল শিরস্ত্রাণে। এই বন্দোবস্তে অন্তত ন-দশ ঘণ্টা বাতাস সরবরাহ করা যাবে।

কিন্তু জলের তলায় আপনি দেখতে পাবেন কী করে?

কেন? কোমরবন্ধে বৈদ্যুতিক মশাল বাঁধা থাকবে।

আর বন্দুক? জলের তলায় বন্দুক কাজে লাগবে কী করে?

প্রফেসর, এ সাধারণ বন্দুক নয়। সংমিত বাতাসের চাপে এর গুলি ছুটে চলে–গুলিগুলো সব বৈদ্যুতিক। শিকারের গায়ে লাগলেই বোমার মতো ফেটে যায়। এককেটা বন্দুকে এরকম দশটা করে গুলি থাকে।

ছোটোহজরি শেষ করে আমরা ডুবুরি-পোশাকের ঘরে গেলুম। ঘরটা ইঞ্জিন ঘরের পিছনে। সেখানে দেয়ালে গোটা বারো পোশাক বুলিছে। এই ডুবুরিপোশাকের পরিকল্পনা যিনি করেছেন, তাঁর সৃজনী-প্রতিভার তারিফ না-করে পারা যায় না। তামার পাতার উপর খুব পুরু রবারের প্রলেপ লাগানো এই পোশাকের আগাগোড়া কোথাও শেলাই নেই। পা দুটো ক্রমশ সরু হয়ে নেমে এসেছে শিশে-দিয়ে-ভারি-করা পুরু দুটো জুতোর মধ্যে; হাতে দস্তানাও ওইভাবেই পরতে হয়। ক্যাপ্টেন নেমোর অনুচরদের সাহায্যে কোনোরকমে এই মস্ত ভারি পোশাক পরা গেলো। তারপর পিতলের শিরস্ত্রাণ আঁটার পালা : পিতলের কলারের সঙ্গে স্ক্রু দিয়ে ওই ভারি শিরস্ত্রাণ এটে দেয়া হলো। শিরস্ত্রাণের মধ্যে তিনটে পুরু কাচের জানলা রয়েছে, যাতে আশেপাশে বা সামনে তাকাতে কোনো অসুবিধে না-হয়। নিশেস নিতেও কোনোরকম কষ্ট হলো না। তারপরে আমরা এক অদ্ভুত ধরনের বন্দুক কাঁধে ঝুলিয়ে জলের তলায় শিকারে বেরোবার জন্য তৈরি হয়ে নিলুম।

পোশাকটা এতই ভারি যে নড়াচড়ার কোনো ক্ষমতাই ছিলো না। আমাদের ওরা ঠেলেঠুলে পাশের ছোট্ট কোঠাটায় ঢুকিয়ে দিলে; ক্যাপ্টেন নেমোও আরেকজন ডুবুরি-পোশাক পরা অনুচর নিয়ে আমাদের সঙ্গে এলেন। তারপর ঘরটা অন্ধকার হয়ে গেলো। সঙ্গে সঙ্গে শোঁ-শোঁ করে একটা শব্দ উঠলো অন্ধকারে; অনুভব করলুম যে পায়ের তলা থেকে একটা ঠাণ্ডা স্রোত উপরে উঠে আসছে। বুঝতে পারলুম, ছোট্ট কোঠাটিতে জল ঢুকছে; দেখতে-দেখতে ঘরটা জলে ভরে গেলো। তারপরেই খুলে গেলো একটা ভারি ঢাকার মতো দরজা। উজ্জ্বল সবুজ আলো জ্বলে উঠলো পাশে। পরক্ষণেই ডুবো-জাহাজের ভিতর থেকে আমরা বেরিয়ে এসে সমুদ্রের তলায় এসে নামলুম।

ক্যাপ্টেন নেমোই আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চললেন। মাঝখানে রইলুম আমি আর কোনসাইল-সকলের পিছনে রইলো ক্যাপ্টেন নেমোর সেই অনুচর। নীলচে আলোয় একশো ফুট পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। তারপরেই নীল কুয়াশায় সব ঢাকা পড়ে আছে। এত ভারি পোশাক পরে জলের নীচে হাঁটতে মোটেই অসুবিধে হচ্ছিলো না, বরং বেশ হালকা লাগছিলো আর কেমন যেন নতুন-এক মজার অনুভূতি হচ্ছিলো। বেলা তখন দশটা হবে। সূর্যের আলো জলের মধ্যে প্রতিসরিত হয়ে মসৃণ বালির উপর থেকে ঠিকরে পড়ছিলো। তারও কিছুক্ষণ পরে সূর্যকিরণ টেরচাভাবে জলের মধ্যে প্রবেশ করলো–আর তেলা কাচের মধ্য থেকে যেমন সাত রঙে ভেঙে আলো বিচ্ছুরিত হয় তেমনিভাবে বর্ণালির মতোই তা সাত রঙে ভেঙে গেলো। এর সেই সাত রঙের স্নিগ্ধ সুষমা সিন্ধুতলের এই আশ্চর্য জগতে যেন কোনো অপূর্ব স্বপ্নলোক সৃষ্টি করে গেলো। কত বিচিত্র উদ্ভিদ, গুল্ম, কঠিন আঁশে টাকা প্রাণী যেন বর্মাবৃত, আর কত অগুন্তি ধরনের মাছ যে চোখে পড়লো, তার কোন ইয়ত্তা নেই। সেই নীল আলো-অন্ধকারের মধ্যে, নটিলাসকে ধীরেধীরে অনেক পিছনে ফেলে আমরা স্বপ্নের মতো সুন্দর এক অস্পষ্ট

দেশে অনেক বাঁও জলের তলায় এগিয়ে গেলুম, যেখানে শ্যাওলা-শামুক-হাড়ের পাকে পাকে আশ্চর্য ও ঐশ্বর্যময় সিন্ধু-রূপান্তরে কালক্রমে সমস্ত কিছুই বদলে যায়।

বেলা একটা নাগাদ ক্রেসপো অ্যাইল্যাণ্ডের জঙ্গলে প্রবেশ করা গেলো। সিন্ধুতলের সেই আশ্চর্য অরণ্যের মধ্যে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে। মস্ত গাছপালার মতো বিরাট-বিরাট উদ্ভিদ সোজা উঠে গেছে উপরে; ঘোটৰাটো গুল্ম থেকে শুরু করে গাছের ডাল-পালারও এই ঊর্ধ্বমুখ বৃদ্ধি সত্যি লক্ষ্য করার মতত। ডাঙার উপরে জঙ্গলে যেমন কত জানা-অজানা ফুল পাপড়ি ছড়িয়ে দেয় তেমনি ফুটে উঠছে সামুদ্রিক উদ্ভিদ সী-অ্যানিমোন পাপড়ির মতো ছড়িয়েপড়া ডালপালায় যেমন গুঞ্জন করে খেলা করে পাখিরা, তেমনি সেখানে খেলা করছে নানা রঙের চঞ্চল মাছেরা। ক্যাপ্টেন নেমোর নির্দেশে বিশ্রাম করার জন্য। সেখানেই আমরা বসে পড়লুম। কখন যে ক্লান্তির মধ্যে তন্দ্রা নেমে এসেছিলো জানি না; ঘুম ভাঙতেই দেখি, আমার সামনেই ক্যাপ্টেন নেমোটান হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

আড়মোড়া ভাঙতে গিয়েই চোখে পড়লে প্রথমে। দেখি, এক গজ উঁচু একটি অতিকায় সামুদ্রিক মাকড়শা গনগনে চোখে রাজ্যের ক্রুরতা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। ওৎ পেতে থাকার ভঙ্গি ডাঙার হিংস্র প্রাণীদের মতোই এই মূর্তিমান বিভীষিকাটি যে কোনো মুহূর্তে প্রচণ্ড ভাবে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, তা বুঝতে আমার মোটেই দেরি হলো না–আর তাতেই আমার চটকা ভেঙে গেলো। ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ালুম। কোনসাইল আর ক্যাপ্টেন নেমোর অনুচরটিও তক্ষুনি উঠে দাঁড়ালে। ক্যাপ্টেন নেমোর ইঙ্গিতে তার অনুচরটি তার বন্দুকের কুঁদো দিয়ে এক বিষম আঘাত হানলে এই অষ্টভুজ

মাকড়শাটিকে, বাস, পরমুহূর্তেই সেই দানবিক কীটটার আট বাহু কিলবিল করে কুণ্ডলী পাকিয়ে গেলে যন্ত্রণায় প্রচণ্ডভাবে ছটফট করতে লাগলো সে।

আবার এগিয়ে চললুম আমরা। ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে যাচ্ছে সিন্ধুতলের জমি। সেই গাঢ়-নীল কুয়াশাও ক্রমশ সব-কিছু ঢেকে ফেলেছে। এখানে এসেই ক্যাপ্টেন নেমো বৈদ্যুতিক লণ্ঠন জ্বালিয়ে দিলেন। বল্লমের মতো আলোর ফলা অন্ধকারকে আক্রমণ করে হঠিয়ে দিলে। তারপরেই সামনে তাকিয়ে দেখি গ্র্যানিট পাথরের খাড়া দেয়াল। বোঝা গেলো, ক্রেসপো আইল্যাণ্ডের তলায় আসা গেছে।

ক্যাপ্টেন নেমো থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। এটাই তাঁর রাজ্যের সীমাতারপরেই প্রবলকঠিন ডাঙা। এবার ফিরে যেতে হয়। ফেরার সময় নেমে আমাদের অন্য পথে নিয়ে এলেন। বেশ খানিকটা চড়াই বেয়ে ওঠবার পর হঠাৎ একটি সামুদ্রিক শ্যাওলার ঝোপ লক্ষ্য করে বন্দুক ছুড়লেন ক্যাপ্টেন নেমো। অমনি ছটফট করতে করতে একটি সিন্ধু-ভেদড় ছিটকে পড়লো। লম্বায় প্রায় পাচফুট হবে এই সিন্ধু-ভোঁদড়, রুপোলি আর বাদামী রঙের চামড়াটা নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান হবে–বোধ করি সেই জন্যেই মরা ভোঁদড়টিকে নেমোর অনুচরটি কাঁধের উপর ঝুলিয়ে নিলে।

ক্রমে আবার বালির রাজ্যে চলে এলুম। জল এখানে এতই কম যে মাঝেমাঝে আমাদের উল্টো-প্রতিবিম্ব দেখা যাচ্ছিলো জলের উপরে। দূরে নটিলাস–এর আলো ঝাঁপশাভাবে দেখা যাচ্ছে। নটিলাসকে দেখে তাড়াতাড়ি এগোতে যাবো, অমনি এক ধাক্কায় নেমে আমাকে গুল্মরাশির উপরে ফেলে দিলেন। তার সঙ্গীটিও কোনসাইলকে তেমনি জোর করে ওই ঝোঁপের আড়ালে শুইয়ে দিলে। হঠাৎ এই আক্রমণের কারণ কী, তা বোঝবার

আগেই দেখি ক্যাপ্টেন নেমোও মাথা নিচু করে আমার পাশে শুয়ে পড়েছেন। তাঁর সঙ্গীটিও তা-ই করলে।

তারপরেই যা চোখে পড়লো তাতে আমার বুকের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেলো। দেখি দুটো প্রকাণ্ড আকৃতির হাঙর মাথার উপর দিয়ে মন্থরভাবে ভেসে যাচ্ছে। জলের এই নেকড়ে দুটির সামনের দিক থেকে ফসফরাসের দীপ্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছিলো বলে চিনতে মোটেই অসুবিধে হয় না। হাঙর! স্বচ্ছ ফটিকের মতো চোখ, বিকট মুখে সারি-সারি প্রবল-ভীষণ দাঁত, আর রূপোর মতো পেট নিচে থেকে স্পষ্ট দেখা গেলে। প্রায় ছুঁয়ে গেলে তারা আমাদের, তবু যে দেখতে পেলো না এটা আমাদেরও পরম সৌভাগ্য। না-হলে এই ভীষণ সিন্ধু-নেকড়ের সঙ্গে যুদ্ধে কী ফলাফল হতে কে জানে।

আধ ঘণ্টা পরে নটিলাস-এ পৌঁছোলুম। বাইরের ঢাকনাটা তখনো খোলা; ভিতরে ঢোকার পর ঢাকনাটা বন্ধ করে ক্যাপ্টেন নেমে একটা বোম টিপে দিলেন। আস্তে-আস্তে ঘরের জল নেমে গেলো।

ডুবুরি-পোশাক খুলে রেখে যখন নিজের কামরার দিকে এগোচ্ছি, তখন অবসাদে আমার সর্বাঙ্গ ভারি হয়ে এসেছে।

সিন্ধুয়োল

পরের দিন সকালে জেগে উঠতেই দেখি শরীরটা বেশ হালকা আর ঝরঝরে লাগছে। প্ল্যাটফর্মের উপরে গিয়ে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে দেখলুম। স্বচ্ছ সুন্দর আবহাওয়া, দিগন্তে কোনো জাহাজের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। ফেনিল নীল জলের উপর সূর্যের আলো পড়ে ঝিকিয়ে উঠছে। শান্ত সমুদ্রের মধ্যে কোন অনন্ত ছন্দে ঢেউ উঠছে আর পড়ছে, খানিকক্ষণ পরেই যে-ছন্দ রক্তের মধ্যে নেশা ধরিয়ে দেয়।

সমুদ্রের এই নেশা ধরানো ছন্দ যেন আমার বুকের মধ্যেই ঢেউ তুলে দিলে। সমুদ্রের এই অনন্ত কলরোল শুনছি কান পেতে, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমে এসে দেখা দিলেন। আমার উপস্থিতি তাঁর চোখেই পড়লো না। সমুদ্র পর্যবেক্ষণ করে কী-এক দুর্বোধ ভাষায় তিনি কতগুলো নির্দেশ দিলেন।

ডেকের চারধারে আগের রাতে জাল পেতে রাখা ছিলো-সকালে তাতে অনেক মাছ ধরা পড়েছে। বিশজন নাবিক উঠে এসে সেগুলি তুলে নিতে লাগলো। এই নাবিকদের মধ্যে পৃথিবীর সব জাতের লোকই বোধ করি আছে। আইরিশ, ফরাশি, স্লভ, গ্রীক-ইয়োরোপের প্রায় সব দেশের লোকই দেখতে পেলুম আমি। কিন্তু তারা সবাই কথা বলে সেই দুর্বোধ বিদঘুটে ভাষায়, যার একবর্ণও আমি বুঝি না; আর তার ফলে এদের জাগিত পরিচয়ও বুঝে-ওঠা মুশকিল। নাবিকরা কেউ আমাকে যেন লক্ষই করলে না, সবাই নিজেদের কাজেই ব্যস্ত হয়ে রইলো।

নটিলাস একটানা দক্ষিণ-পুব দিকে ছুটে চলেছে। পয়লা ডিসেম্বর আমরা বিষুবরেখা পেরিয়ে এলুম। মাঝে-মাঝে কেবল প্রশান্ত মহাসাগরের অরণ্যময় অজ্ঞাত দ্বীপ ছাড়া আর কোনো চেনাঅচেনার ভূখণ্ডই কখনো চোখে পড়ে না। সমুদ্র এখন মরা পাহাড়ে বিপজ্জনক। জলের তলায় কত জাহাজের ধ্বংসাবশেষ যে দেখা গেলো, তার সংখ্যা নেই। কামানে-বন্দুকে শ্যাওলা গজিয়েছে; জাহাজের, কামরায় কাকড়ার রাজত্ব, পাটাতনের খোলে হাঙর ঘুরে বেড়ায়। দক্ষিণ সমুদ্রের রক্তলাল প্রবাল দ্বীপ পেরিয়ে আসার সময় দেখতে পেলুম অনেক বছর আগে ডুবেযাওয়া বহু জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। কাঠের খোল আর পাটাতন পচে গিয়েছে, জীর্ণ ও নরম হয়ে আছে তারা। মাঝে মাঝে ওই সব জাহাজের উদ্দেশ্যে নটিলাস-এর বাহিনী বেরোয়; জীর্ণ জাহাজের মধ্য থেকে যাবতীয় মূল্যবান সম্পত্তি উদ্ধার করে নিয়ে এসে জাহাজে তোলে।

শেষকালে প্রবাল সমুদ্রও পেরিয়ে গেলো নটিলাস। আমার এখন আর। ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে বেশি দেখা হয় না। মাঝে-মাঝে আসেন তিনি, অল্পক্ষণ কথাবার্তা হয়, তারপরেই আবার তিনি নটিলাস-এর পরিচালনায় ব্যস্ত হয়ে চলে যান। একদিন ক্যাপ্টেন নেমোর কাছ থেকে শোনা গেলো, অষ্ট্রেলিয়া আর নিউগিনির মধ্যকার টোরেজ প্রণালী দিয়ে আবার আমরা ভারত মহাসাগরে গিয়ে পড়বে। এখানে চোরা পাহাড়ের সংখ্যা এত বেশি যে যে-কোনো মুহূর্তে বিষমকোনো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। নিজের হাতে নটিলাস চালাবার ভার নিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। নটিলাস জলের উপর ভেসে উঠলো। যেন তিনি ইন্দ্রজাল জানেন, এমনিভাবে ভোজবাজির মতো চোরা পাহাড়ের বিপদসংকুল রন্ধ্রপথ দিয়ে অত বড়ো ডুবোজাহাজটিকে সন্তর্পণে পার করে নিয়ে যেতে লাগলেন তিনি। একটা দ্বীপের কাছ দিয়ে যাবার সময় হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো, আমি ছিটকে পড়ে গেলুম ডেকের একপাশে।

আসলে চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়েছিলো নটিলাস; পাহাড়ের খাজে আটকে গিয়েছে ওই ধাক্কায়। এমনিতে কোনো বিপদ হয়নি, তবে পুরো ভরা জোয়ারের সময় ছাড়া এই খাজ থেকে উদ্ধার পাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। পাঁচদিন পরে পূর্ণিমা; তখন জোয়ারের জলে নটিলাস ভেসে উঠবে। ততদিন এখানে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হলে জিগেস করেছিলুম, কোনো দুর্ঘটনা ঘটেছে বুঝি?

না, দুর্ঘটনা নয়, ঘটনা—

এমন ঘটনা যে আপনাকে তার ফলে ডাঙায় আশ্রয় নিতে হবে?

অদ্ভুতভাবে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো। তারপর আস্তে বললেন, নটিলাসকে আপনি এখনো চেনেননি, প্রফেসর।

তক্ষুনি আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করে ফেললুম! নেড আর কোনসাইলের বড় ইচ্ছে এই কটা দিন জাহাজে না-থেকে সামনের দ্বীপটায় ঘুরে আসে। কত দিন ডাঙায় পা দেয়নি ওরা। আপনার কোনো আপত্তি আছে কি?

আসলে প্রবল আপত্তিরই প্রত্যাশা করছিলুম আমি। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে ক্যাপ্টেন নেমে বললেন, নিশ্চয়ই না। ইচ্ছে করলে আপনিও যেতে পারেন, মঁসিয় আরোনা।

পরের দিন নটিলাস-এর কুলুঙ্গি থেকে নৌকো নামানো হলো। আটটার সময় বন্দুকে কুড়লে সজ্জিত হয়ে রওনা হলুম আমরা। নেড হাল ধরে বসলো, আমি আর কোনসাইল প্রাণপণে দাঁড় টানলুম। নেড ল্যাণ্ডের ফুর্তির আর শেষ নেই। এতদিনে ওই জেলখানা থেকে সে মুক্তি পেয়েছে, আর কোনদিন সেখানে ফিরে যাবার মতলব তার নেই।

জিলবোয়া দ্বীপের বালিতে নটিলাস-এর নৌকো গিয়ে যখন ঠেকলো, তখন সাড়ে-আটটা বাজে।

জিলবোয়ার জঙ্গলিরা

সত্যি বলতে, ডাঙায় পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে কেমন অদ্ভুত একটা মুক্তির আনন্দ ছড়িয়ে পড়লো আমার মধ্যে। আসলে নটিলাস-এ যে কখনো কষ্টে ছিলুম তা নয় বরং কোনো রকম অস্বাচ্ছন্দ্যেরই অবকাশ ছিলো না সেখানে। যখনই যা। চাই, তৎক্ষণাৎ তা হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়। এমনকী ক্যাপ্টেন নেমোর বিরাট গ্রন্থাগারে আমার পড়াশোনার কোনো অসুবিধে হতো না। উপরন্তু নটিলাস,-এর কাচের জানলা দিয়ে এই আশ্চর্য সিন্ধুতলের অভিজ্ঞতা হয়েছিলো আমার, পৃথিবীর অন্য কোনো বিজ্ঞান সাবকের যে-সৌভাগ্য হয়নি। কিন্তু সব সতেও শক্ত মাটিতে পা দেয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুঝতে পারছিলুম আসলে আমরা ডাঙারই জীব–সম্পূর্ণভাবে পারিপার্শ্বিকের ক্রীতদাস। অথচ আমরা মাত্র দু-মাস ধরে নটিলাস-এর যাত্রী হিশেবে সিন্ধুতলে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

আমাদের অভিযান তাই আনন্দে ও উৎসাহে ভরে গেলো। নেডের ফুর্তি আর উৎসাহের তো আর শেষ নেই। তার নাকি মাছ খেয়ে-খেয়ে অরুচি ধরে গেছে; ডাঙার জগতের পশুপক্ষীর মাংস ভক্ষণ না করা অবধি তার মুখে নাকি আর কখনোই রুচি ফিরবে না। তাই টো-টো করে বনেজঙ্গলে ঘুরে বেড়ালুম আমরা শিকারের উদ্দেশ্যে। রাত্রে সমুদ্রের তীরে বসে মাংস পুড়িয়ে আর চেনা-অচেনা সুস্বাদু ফলে আমাদের নৈশভোজ সাঙ্গ হলো। কাছেই আমাদের নৌকো বাধা; একটু দূরে নটিলাস কোনো মস্ত পাথরের মতো সমুদ্রের উপর স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

নেড ল্যাণ্ডের প্রচণ্ড ফুর্তি আমাদের নৈশভেজকে আরো চঞ্চল ও আনন্দময় করে তুললো। তার তৃপ্তি এইখানেই সবচেয়ে বেশি যে নটিলাস-এর নরাধমেরা কিছুতেই এই উপাদেয় খাদ্যের আস্বাদ পাচ্ছে না।

দ্বিতীয় দিনও সন্ধ্যার পরে দ্বীপের উপকূলে আমাদের সৈশভোজ সাঙ্গ হলো। আর খেতে-খেতে এই প্রথম আমি কোনসাইলের মুখে তার গোপন ইচ্ছার প্রকাশ শুনতে পেলুম, আহা! আজ সন্ধ্যায় যদি ওই নটিলাস-এ ফিরতে না-হতো।

যদি কোনোদিনই না-ফিরি, নেড ল্যাণ্ড যোগ করে দিলে। কিন্তু তার কথা শেষ হবার আগেই আচম্বিতে আমাদের পায়ের কাছে একটা মস্ত পাথর এসে পড়লো। সচমকে জঙ্গলের দিকে তাকালুম আমরা।

আকাশ থেকে তো আর পাথর পড়ে না, কোনসাইল বললে, অন্তত উল্কা নাহলে। বলে কোম্পাইল তার হাতের পায়রার ঠ্যাংটায় কামড় বসাতে যাবে, এমন সময় দ্বিতীয় আরেকটা পাথর এসে পড়লো—পড়লো ঠিক তার হাতেই, এবং পায়রার ঠ্যাংটা তার হাত থেকে বশে পড়ে গেলো।

তিনজনেই উঠে দাঁড়িয়ে বন্দুক তুলে ধরলুম; কেউ কোনো আক্রমণ করলে তাকে সমুচিত উত্তর দিতে হবে।

বাঁদরের কাণ্ড নয় তো? নেড ল্যাণ্ড জিগেস করলো।

বনমানুষই বটে, কোনসাইল বললে, তবে তাদের জংলি বলা হয়।

নৌকোয়-শিগগিরি নৌকোয় চলো। বলেই দৌড়োতে লাগলুম আমি। এ-সব দ্বীপে সে চতুষ্পদ শ্বাপদের চেয়ে দ্বিপদ নারখাদকের ভয়ই বেশি, তা আমার জানা ছিলো।

তৎক্ষণাৎ গাছপালার আড়াল থেকে তীরধনুক নিয়ে জনাকুড়ি জংলির আবির্ভাব ঘটলো। আমরা যেখানে বসে নৈশভোজ সারছিলুম, নৌকোটা সেখান থেকে প্রায় ষাট ফিট দূরে বাঁধা ছিলো। ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটলুম আমরা নৌকো লক্ষ্য করে। নেড কিন্তু এই বিষম বিপদের মধ্যেও তার ফলমূল আর মাংসের সংগ্রহ আনতে ভুললো না। আরো কয়েকটা ঢিল এসে পড়লো আশেপাশে। ঝপাঝপ করে দাড় টেনে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নটিলাস-এ পৌঁছে গেলুম।

নটিলাস-এ পৌঁছেই আমি সেলুনের দিকে ছুটলুম। কারণ অর্গানের প্রবল গম্ভীর সুর থেকে বোঝা যাচ্ছিলো যে ক্যাপ্টেন নেমো সেলুনে বসে অর্গান বাজাচ্ছেন।

ক্যাপ্টেন, উত্তেজিতভাবে ডাক দিলুম আমি।

সুরের মধ্যে ডুবে আছেন যেন তিনি, আমার কথা তার কানেই পৌঁছালোনা। তার হাত ধরে আবারও আমি বললুম, ক্যাপ্টেন নেমো!

যেন ছন্দ কেটে গেলো, কেঁপে উঠে ফিরে তাকালেন নেমো। ও আপনি। তা শিকার কেমন লাগলো? উদ্ভিদবিদ্যার কোনো নতুন তথ্য যোগাড় হলো?

হ্যাঁ, ক্যাপ্টেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আমরা একদল দ্বিপদকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি, বংশপরম্পরায় যাদের বেশ বিপজ্জনক বলে খ্যাতি আছে।

তা সেই দ্বিপদগুলো কী?

জংলি।

জংলি? ক্যাপ্টেন নেমোর কণ্ঠস্বর ব্যঙ্গে ভরে গেলো, পৃথিবীর এক জায়গায় পা দিয়ে বর্বর জংলি দেখে আপনি অবাক হচ্ছেন, প্রফেসর? একটা জায়গার নাম করুন তো যেখানে বর্বরদের বাস নেই? আর তাছাড়া আপনি যাদের বর্বর জংলি বলেন তারা কি অন্য কারো চেয়ে কোন অংশে নিকৃষ্ট?

কিন্তু ক্যাপ্টেন—

জংলিরা কোথায় নেই, প্রফেসর? আমার কথা যদি বরেন, মঁসিয়, তো জানাই : আমি এই বর্বরদের পৃথিবীর সর্বত্র দেখেছি।

তা আপনি যদি নটিলাস-এর মধ্যে তাদের না-দেখতে চান তত আপনাকে তাদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

সে সম্বন্ধে আপনাকে ভাবতে হবে না, প্রফেসর। এতে উদ্বিগ্ন হবার কিছু নেই।

কিন্তু ওরা যে সংখ্যায় অগুন্তি।

কতজনকে দেখেছেন আপনি?

অন্তত একশো তো হবেই।

মঁসিয় আরোনা, ক্যাপ্টেন নেমো আবার অর্গ্যানের চাবিতে হাত দিলেন, যদি পাপুয়ার সমস্ত বর্বর এসে চড়াও হয় তবু নটিলাস-এর গায়ে একটা আঁচড় কাটার ক্ষমতা কারো নেই, বলেই আমার অস্তিত্ব সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে আবার তিনি অর্গ্যানের উপর ঝুকে পড়লেন।

পরের দিন কাতারে কাতারে পাপুয়ার জংলিরা চারপাশ থেকে নটিলাসকে ঘিরে ধরলে, কিন্তু জাহাজের উপরে উঠতে বা জাহাজের খুব কাছে আসতে দের কারো সাহসে কুলোলো না। সারাদিন তারা তীরে ভিড় করে রইলো; রাতে তীরে-জলে-ওঠা অজস্র অগ্নিকুণ্ড দেখেও বোঝা গেলো অচিরে নটিলাস-এর সঙ্গ ত্যাগ করার মতলব তাদের নেই।

তার পরের দিন ডেকের উপর উঠতেই দেখা গেলো গোটাকুড়ি ফাপা গাছের ক্যানো জলে ভাসিয়ে বিস্তর পাপুয়া যোদ্ধা নটিলাস লক্ষ্য করে এগিয়ে আসছে। আমাকে আর কোনসাইলকে দেখেই তারা চাচামেচি করে উঠলো। তার পরেই আমাদের আশপাশে এক ঝাঁক তীর এসে পড়লো।

এবারে তাহলে সত্যি তারা আক্রমণ করার জন্য উৎসুক। অথচ জোয়ার নাএলে একচুলও নড়ানো যাবে না নটিলাসকে। তাহলে আর রক্ষে নেই। হন্তদন্ত হয়ে নিচে গিয়ে ক্যাপ্টেন নেমোকে খবর দিলুম। নেমো কিন্তু আদৌ কিছুমাত্র বিচলিত না-হয়ে

নটিলাস-এর বহির্দ্বার বন্ধ করে দেবার আদেশ দিলেন। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, মিথ্যেই আপনি এত উত্তেজিত হচ্ছেন, প্রফেসর। আপনাদের যুদ্ধ জাহাজের কামানের গোলাই যদি নটিলাস-এর গায়ে আঁচড়টি কাটতে না-পারে, তাহলে কয়েকশো পাপুয়াই বা তীর-ধনুক নিয়ে কী করবে, বলুন?

কিন্তু ক্যাপ্টেন, কাল বাতাস নেবার জন্য আপনাকে তো নটিলাস-এর ঢাকনি বা বহির খুলতেই হবে —তখন যে জংলিরা ভিতরে ঢুকে পড়বে।

মঁসিয় আরোনা, ঠাণ্ডা গলায় বললেন ক্যাপ্টেন নেমে, বহিরি খোলা থাকলেও কি নটিলাস-এর ভিতরে ঢোকা এতই সহজ? আপনি কিছুমাত্র বিচলিত হবেন না। হ্যাঁ, ভালো কথা। নটিলাস কিন্তু কাল দুটো চল্লিশের সময় জোয়ারের জলে ভেসে উঠবে। জংলিদের প্রসঙ্গে আর কোন কথাই বললেন না ক্যাপ্টেন নেমো। এই ক-দিন এই অদ্ভুত মানুষটিকে যতটুকু চিনেছিলুম, তাতে আমিও আর কোনো উচ্চবাচ্য করে নিজের ঘরে ফিরে এলুম।

ফিরে এলুম বটে, কিন্তু সে রাতে জংলিদের উৎপাতে ভালো করে ঘুমানো গেলো না। সারা রাত তারা নটিলাস-এর উপর উন্মাদের মতো দাপাদাপি করলে, আর থেকে-থেকে রক্ত-জল-করা রণহুংকার দিলে।

পরের দিন বেলা যখন দুটো পঁয়ত্রিশ, ক্যাপ্টেন নেমে আমাকে ডেকে ওঠার সিঁড়ির কাছে নিয়ে গেলেন। গিয়ে দেখি নেড আর কোনসাইলও সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। ক্যাপ্টেন নেমোর নির্দেশ মতো একটি নাবিক বহির্দ্বারটি খুলে দিলে।

তৎক্ষণাৎ বিকট উল্কি-কাটা একটি বিশ্রী মুখ দেখা গেলো ফোকর দিয়ে; পর মুহূর্তে সে সিঁড়ির রেলিঙে হাত রাখলে নিচে নামবে বলে, আর পরক্ষণেই কানফাটা আর্ত চীৎকারে জংলিটা লাফিয়ে উঠলো। আরো কয়েকটি জলি কৌতূহলভরে রেলিঙে হাত দিতেই তাদেরও ওই একই ভাবে চীৎকার করে লাফিয়ে উঠতে হলো। তিড়িং-তিড়িং করে লাফিয়ে ওরা গিয়ে নামতে থাকলো ক্যানোয়। ডেকের উপর একটা দারুণ হট্টগোল শুরু হয়ে গেলো। ব্যাপার দেখে কোনসাইল তো হেসেই লুটোপুটি!

কী ব্যাপার বুঝতে না পেরে আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইলুম। নেভের আবার কৌতূহল আর বুকের পাটা দুটোই কিঞ্চিৎ বেশি, তাই সেও সিঁড়ির রেলিঙে হাত রেখে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করলো। সঙ্গেসঙ্গে সেও বিকট চীৎকার করে আমাদের দিকে ছিটকে এলো।

বিদ্যুৎ! বিদ্যুৎ! বাজ পড়েছে আমার উপর!

নেডের চঁচানি শুনেই সমস্ত রহস্যটা আমার কাছে পরিস্কার হয়ে গেলো। ক্যাপ্টেন নেমে রেলিঙের মধ্যে বিদ্যুৎ চার্জ করে দিয়েছেন এমন মাত্রায় দিয়েছেন যে প্রবল ধাক্কা লাগবে কেবল, তাছাড়া আর কোনো ক্ষতিই হবে না; কিন্তু তাতেই মন্ত্রের মতো কাজ হলো। সমস্ত ব্যাপারটা ভৌতিক বা অপার্থিব ভেবে উন্মাদের মতো পাপুয়ারা পালাতে লাগলো, দেখতে-খেতে তাদের চীৎকার দুরে মিলিয়ে গেলো।

ইতিমধ্যে জোয়ারের জলে নটিলাস ভেসে উঠেছিলো। ঠিক দুটো চল্লিশের সময় ইঞ্জিন জেগে উঠলে সশব্দে; শুরু হলো চাকার আন্দোলন; ধীরে ধীরে সেই ভয়ানক টোরেজ প্রণালীকে পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলো নটিলাস।

ভয়ংকরের গান

পরের দিন সকাল বেলা নটিলাস-এর প্ল্যাটফর্মে গিয়ে দেখি ফাস্ট অফিসার সমুদ্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে যথোচিত নির্দেশ দিচ্ছেন। নটিলাস তখন ১০৫ দ্রাঘিমা আর ৭৫° দক্ষিণ অক্ষরেখায় প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলেছে–সম্ভবত এই ক-দিন টোরেজ প্রণালীতে আটকে থাকতে হয়েছে বলেই এত জোরে সে যাচ্ছে।

আমি প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াবার পরক্ষণেই ক্যাপ্টেন নেমোও সেখানে এসে দাঁড়ালেন, তারপর দুরবিন দিয়ে কিছুক্ষণ দিগন্তের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

পাথরের মূর্তির মতো কিছুক্ষণ স্থির দাঁড়িয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো, তারপর দুরবিন নামিয়ে কী এক দুর্বোধ ভাষায় ফাস্ট অফিসারকে কয়েকটি কথা বললেন। তিনি; ফাস্ট অফিসারকে অত্যন্ত অস্থির ও উত্তেজিত দেখালো, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর শান্ত সংযত মূত দেখে কোলে কিছুই বোঝবার জো ছিলো না। আমার দিকে দৃকপাত পর্যন্ত না করে কিছুক্ষণ ইতস্তত পায়চারি করলেন ক্যাপ্টেন, মাঝেমাঝে কেবল একটু থেকে-থেকে দিগন্তের সেই বিশেষ দিকটাতে তাকাতে লাগলেন। ফাস্ট অফিসারও তার দুরবিন দিয়ে বারে বারে সেই দিকে তাকাচ্ছিলেন। কিন্তু আমি সেদিকে তাকিয়ে কিছুই আবিষ্কার করতে পারলাম না। সূর্য আর সমুদ্রের মিলনমন্দিরে কিছুই দেখা গেলো না। এই বিশাল সমুদ্রের মধ্যে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে কী দেখতে পেয়েছেন তারা? হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো ফাস্ট অফিসারকে কী একটা নির্দেশ দিতেই নটিলাস-এর গতি আরো বেড়ে উঠলো।

আমার আর এই রহস্য ভালো লাগলো না। অধীরভাবে সেলুনে ফিরে গিয়ে একটা দুরবিন নিয়ে চোখে দিলুম। কিন্তু কিছু নিরীক্ষণ করার আগেই এক হ্যাচকা টানে তা হাত থেকে খশে পড়লো।

পিছন ফিরে তাকিয়ে যাকে দেখলুম তিনি ক্যাপ্টেন নেমো হলেও তাকে আমি চিনি না। সম্পূর্ণ বদলে গেছেন তিনি। কেঁচকানো ভুরুর তলায় চোখের তারা দপদপ করে জ্বলছে; দৃঢ় বিন্যস্ত ঠোঁটের ভিতর দাঁতে দাঁত চেপে আছেন তিনি; কেমন যেন শক্ত হয়ে গেছে তার শরীর; কঠিন হয়ে উঠেছে মুখচ্ছবি, আর তার আস্ত প্রতিচ্ছবি থেকে কী-এক প্রচণ্ড ঘৃণা ফুটে বেরোচ্ছে।

তাহলে কি না-জেনে এমন কোনো অপরাধ করেছি যাতে রোষে তার সমগ্র মূর্তি এমন বদলে গেছে? কিন্তু পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম তার রোষ ও ঘৃণার উৎস আমি নই, কারণ কঠিনভাবে তখনও তিনি দিগন্তের সেই বিশেষ কোণটিরই দিকে তাকিয়ে আছেন। ফাস্ট অফিসারকে কোনো বিদেশি ভাষায় অল্প কয়েকটি কথায় নির্দেশ দিতে দিতে নিজেকে তিনি সামলে নিলেন।

মঁসিয় আরোনা, নটিলাস-এ আশ্রয় দেবার সময় আপনাদের যে-শর্ত দিয়েছিলুম, তা মান্য করার সময় এসেছে এখন।

কী বলতে চাচ্ছেন, তা ঠিক বুঝতে পারছি না।

আপনাদের তিনজনকেই একটি ঘরে বন্দী করে রাখা হবে। পরে অবিশ্যি আবার যথাসময়ে চলাফেরার স্বাধীনতা ফিরে পাবেন।

আপনি নটিলাস-এর সর্বময় কর্তা, কাজেই আপনি যা বলবেন তা-ই হবে। কিন্তু একটা কথা আমি জিগেস করব?

না, মঁসিয়, একটাও না।

একথার পর তার নির্দেশ মান্য করা ছাড়া আর কিছুই করার রইলো না। নিচে আসতেই চারজন নাবিক আমাদের নিজকে নিয়ে গেলে সেই ঘরটিতে, যেখানে সর্বপ্রথম আমাদের বন্দী করে রাখা হয়েছিল। টেবিলের উপর ছটোহাজৰি সাজানো হয়েছিলো। নেড গোড়ায় খুব খানিকটা চোটপাট করে তাই খেতে করে দিলে। যদিও আমি সাত-পাঁচ নানা কথা ভাবছিলুম, তবু আমিও দেরি নাকরে হাত লাগালুম। কোনসাইলও কোনো বাক্য ব্যয় না করে দক্ষিণ হস্তে ব্যবহারে তন্ময় হয়ে পড়লো। খাওয়া শেষ হবার পরেই নেড আর কোনসাইল দিব্যি শুয়ে পড়ে ঘুম লাগালো। হঠাৎ এমন অসময়ে ওদের ঘুমিয়ে পড়ার কোনো কারণ বুঝলুম না। আমারও বেজায় ঘুম পাচ্ছিলো। চোখের পাতায় কে যেন আঠা মাখিয়ে দিয়েছে, কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারছি না। সেই আধো-ঘুম আবোজাগরণের মধ্যে চকিতে একটা কথা মাথার মধ্যে খেলে গেলো। বুঝতে পারলুম যে ক্যাপ্টেন খাবারের মধ্যে ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে দিয়েছেন। নটিলাস তখন আর দুলছিলো না, সম্ভবত জলের তলায় ডুব দিয়েছে। তারপর আর কিছু মনে নেই।

পরের দিন ঘুম ভাঙলে কিন্তু আশ্চর্য ঝরঝরে লাগল নিজেকে। তাড়াতাড়ি উঠে বাকা দিতেই দরজা খুলে গেলো। তাহলে এখন আমি স্বাধীন। তাহলে আমার চলাফেরার এখন আর কোনো বাধা-নিষেধ নেই।

করিডরে বেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে যাবার দরজা খোলা দেখে সোজা সেখানে গিয়ে হাজির হলুম। নেড আর কোনসাইলও সেখানে ছিলো তখন। সমুদ্র তেমনি শান্তনীল, আকাশ ফেটে শাদা রোদ চুঁইয়ে পড়ছে, কোনো উপদ্রব বা কিছুরই কোনো চিহ্ন নেই। আর এই শান্ত সমুদ্রের মধ্যেই নটিলাস ভেসে যাচ্ছে তার সমস্ত গোপন রহস্য সমেত। নিচে নেমে এলুম। নটিলাসও জলের তলায় ডুব দিলে। খানিক পরেই আবার ভেসে উঠলো। কয়েকবার এমনি ওঠা-নামা করলো ডুবোজাহাজ—যেন কোনো কারণে বড় অশান্ত, বড় অস্থির হয়ে পড়েছে সে।

বেলা তখন দুটো হবে, আমি সেলুনে বসে আমার দিনলিপি লিখছি, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমে এসে ঢুকলেন। আমার শুভেচ্ছার উত্তরে সামান্য মাথা নুইয়ে চুপ করে অভিবাদন জানালেন, কোনো কথাই বললেন না। তাঁর সমস্ত শরীরে ক্লান্তির ছাপ, চোখ দুটি রক্তবর্ণ–সারা রাতে বোধ হয় এক ফোঁটাও ঘুম হয়নি। অস্থিরভাবে খানিকক্ষণ পায়চারি করলেন তিনি ঘরের মধ্যে। দু-চারটে যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করে দেখলেন কিন্তু এটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো যে, যন্ত্রপাতির দিকে মোটেই তার মন নেই। যেন কি একটা বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করছেন, কিন্তু কিছুতেই আর মনস্থির করতে পারছেন না। শেষকালে হঠাৎ আমার সামনে এসে সোজাসুজি জিগেস করলেন, মঁসিয় আরোনা, আপনি কি কখনো ডাক্তারি করেছেন?

প্রশ্নটা এমনি আকস্মিক যে প্রথমটায় আমি অবাক হয়ে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলাম।

ক্যাপ্টেন নেমো আবার জিগেস করলেন, আপনি কি ডাক্তারি জানেন? আমি এটা জানি যে আপনার কয়েকজন সহকর্মী চিকিৎসা বিদ্যালয় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন–কিন্তু আপনি?

আমিও আসলে ডাক্তার ছিলুম। পারী বিচিত্রাভবনে যোগ দেবার আগে আমি ডাক্তারি করতুম।

তাহলে আমার একজন লোককে আপনি একটু পরীক্ষা করে দেখবেন কি?

কেন দেখবে না? তার কি খুব অসুখ করেছে হঠাৎ?

কোনো কথা না বলে ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে সঙ্গে করে একটা ছোটো কামরায় নিয়ে গেলেন। লোকটি যে মুমূর্ষু, তা বুঝতে এক মুহূর্তও দেরি হলোল। কী একটা ভোতা হাতিয়ারের মারাত্মক আঘাতে তার মাথার খুলি চৌচির হয়ে মগজটা বেরিয়ে এসেছে। রক্তমাথা পট্টিটা খোলার সময় টু শব্দটি পর্যন্ত করলে না সে, শুধু ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো আমার দিকে। মুখ দেখে মনে হলো লোকটা বোধ হয় আসলে ইংরেজ।

দেখার কিছুই ছিলো না বস্তুত। এর মধ্যেই মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিলো তার সর্বাঙ্গে হাত-পা ঠাণ্ডা হতে শুরু করছিলো।

এমন মারাত্মক চোট ও পেল কোত্থেকে? ক্যাপ্টেন নেমোকে আমি জিগেস করলুম।

তা শুনে আপনার কি হবে? হঠাৎ একটা দারুণ ঝাঁকুনিতে ইঞ্জিনের একটা কীলক ভেঙে যায়–লাফিয়ে গিয়ে চোটটা সম্পূর্ণ নিজের মাথায় নিয়ে ও ওর সঙ্গীকে বাঁচিয়ে দেয়। কিন্তু

অবস্থা কী-রকম দেখলেন, বলুন? আপনি নিঃসংকোচে বলতে পারেন কারণ ও ফরাশি জানে না।

বলার কিছুই নেই। বেশি হলে বোধকরি আর মাত্র ঘণ্টা-দুই ওর পরমায়ু।

কিছুতেই কি ওকে আর বাঁচানো যায় না?

না, কিছুতেই না।

ক্যাপ্টেন নেমোর হাত দুটি হঠাৎ কী একটা প্রচণ্ড আবেগে মুঠি হয়ে গেলো। তারপরেই তার চোখ ফেটে বেরিয়ে এলো জলের ধারা।

কী করে মানুষের দেহে প্রাণের স্ফুলিঙ্গ নিভে আসে, আরো কিছুক্ষণ তা-ই দেখে আমি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলুম।

সে-রাত্রে আমার আর ভালো ঘুম হলো না। সারা রাত ধরে ক্যাপ্টেন নেমোর চঞ্চল ও স্পর্শাতুর আঙুলের তলায় গম্ভীর অর্গ্যান কেঁদে উঠলো। মানুষের কোনো আবেগ যেখানে পায়ে হেঁটে যেতে পারে না, সেখানে এই বিষণ্ণ, মর্মন্তুদ, চাপা কান্নার মতো সংগীত যেন কোনো এক পাখির মতো বারেবারে পাখা ঝাঁপটে পেছোতে চাচ্ছে।

পরের দিন সকালবেলায় সমুদ্রের অনেক নিচে নিঃশব্দ এক শোকযাত্রা বোেলো একটি কফিন কাঁধে। প্রবালস্তূপে অন্ত্যেষ্টি হলো লোকটির, আর লাল ফুলের মতো প্রবাল ছড়িয়ে রইলো তার কবরের উপর। সেই স্তব্ধ শোকাতুর শেষ যাত্রার সঙ্গী ছিলুম আমিও। ফিরে

আসার পর ক্যাপ্টেন নেমোক বলেছিলুম, সত্যি হাঙরের খপ্পর থেকে অনেক দূরে আপনাদের এই কবরখানা

হ্যাঁ তাই, গম্ভীরভাবে বললেন ক্যাপ্টেন নেমো, শুধু হাঙর নয়, মানুষেরও কাছ থেকে অনেক দূরে।

সিন্ধুতলে মুক্তো কুড়ুনো

এই রহস্যময় মানুষটির কথা যত ভাবি, তত মনে হয়, এঁকে ছুঁতে পারি এমন সাধ্য আমার নেই। কে ইনি? কোন দেশের মানুষ? কোন গভীর ক্ষত তিনি লুকিয়ে রেখেছেন বুকের ভিতর? কেন সমস্ত মনুষ্য সমাজের প্রতি তাঁর বিরাগ আর বিতৃষ্ণা এমন প্রবল? (এ-সব প্রশ্নের উত্তর জুল ভেন-এর বিখ্যাত উপন্যাস মিস্টিরিয়াস আইল্যাণ্ড-এ দেওয়া হয়েছে।) অথচ তার বুকের মধ্যে যে ভালোবাসার এক অফুরন্ত প্রসবণ আছে তা তো কাল সারা রাত অর্গ্যানের অফুরন্ত কান্নায় উপচে উঠছিলো! কবি, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, বিদ্রোহী, যোদ্ধা—কোমলে ও কঠোরে তুলনাহীন এই মানুষটিকে কোনোদিনই আমি বুঝতে পারবে বলে মনে হয় না। আর তাই আমাদের মাপকাঠিতে তাঁকে বিচার করবার কথাও আমি ভাবতে পারি না।

পরের দিন ভোরবেলায় একটি পরিচারক এসে আমাকে ক্যাপ্টেন নেমোর কাছে ডেকে নিয়ে গেলো। সমুদ্রের নিচে মুক্তোর খেত দেখতে যেতে ইচ্ছুক কি, তিনি জিগেস করলেন। দেখে কে বলবে এই মানুষটিই কাল অমন আর্ত ও ব্যথিত হয়ে উঠেছিলেন।

নেড আর কোনসাইল তো এই লোভনীয় প্রস্তাব শুনেই আনন্দে নৃত্য করে উঠলো। সেই ডুবুরি-পোশাক পরে ছুরি সম্বল করে শুরু হলো আমাদের অভিযান। নেড কিন্তু কিছুতেই হারপুন না-নিয়ে যেতে রাজী হলো না। হারপুন ছাড়া জলের প্রাণীদের মুখোমুখি দাঁড়াতে সে নাকি কিছুতেই রাজী নয়।

ভারত মহাসাগরের এই অঞ্চলে এমন অনেক সামুদ্রিক জীব দেখা গেলো, যাদের কোনো দিন এভাবে দেখতে পাবো বলেও কল্পনা করিনি। তার মধ্যে মস্ত ও ভীষণ একটি কঁকড়াকে দেখে যে-ভয় পেয়েছিলুম, তাও কোনো দিন ভুলবো না।

সমুদ্রতলের মতো রোমাঞ্চকর জায়গা আর নেই। পাহাড় গম্ভীর, বিস্ময়কর, অচঞ্চল–কিন্তু সমুদ্র যেন পৃথিবীর অশান্ত হৃৎপিণ্ড-কোন-এক অধীর আবেগে প্রতি মুহূর্তেই চঞ্চল হয়ে আছে। কোন-এক রহস্যময় ভাষায় সে যেন সবসময়েই কী বলতে চাচ্ছে অসীমকে।

অনেকক্ষণ হাঁটার পর মুক্তো খেতে গিয়ে পৌঁছোলুম। খেতই বটে। যেখানেসেখানে ঝিনুক পড়ে আছে; বাদামি তন্তুর বাঁধনে বন্দী তারাবন্দী, মৃত, ব্যাধিগ্রস্ত। কোন এক অদ্ভুত রোগে যখন তাদের দেহ থেকে ক্ষরণ হতে থাকে অবিরাম, তখন তা-ই জমে জমে ক্রমে এই অমূল্য সিন্ধু-রূপান্তর ঘটিয়ে দেয়; শুক্তির মধ্যে কোনো অধীর অশ্রুর মতো ঝকমক করে ওঠে মুক্তোর দানা। কত যে ঝিনুক পড়ে আছে তার কোনো সীমাসংখ্যা নেই। নেড তো দু-হাতে লুঠ করতে লাগলো-দেখতে দেখতে তার থলি বোঝাই হয়ে গেলো।

ক্যাপ্টেন নেমো তারপরে আমাদের পথ দেখিয়ে মস্ত একটা গুহায় নিয়ে গেলেন। সিন্ধুতলের এই গুহার খোঁজ যে তিনি ছাড়া আর-কেউ রাখে না তা

স্পষ্ট বোঝা গেলো। বড়োবড়ো থামের উপর গুহার ছাদটা দাড়িয়ে আছে, আর আশপাশে সমুদ্রের জীবরা যেন অনধিকার প্রবেশে ক্ষুব্ধ হয়ে অদ্ভুতভাবে লক্ষ্য করে যাচ্ছে

আমাদের। এক জায়গায় এসে ক্যাপ্টেন নেমো থেমে পড়ে আঙুল বাড়িয়ে যা দেখালেন তাতে দস্তুরমতে তাজ্জব হয়ে গেলুম।

গুহাটা সেখানে কুয়োর মত গভীর হয়ে গেছে, আর তারই একেবারে তলায় শুয়ে আছে বিশাল একটি শুক্তি। এত বড়ো ঝিনুক আমি এমনকি নটিলাস-এর সংগ্রহশালাতেও দেখিনি। স্থির শান্ত জলে কত বছর ধরে যে এই ঝিনুকটি বেড়ে উঠেছে তা কে জানে ক্যাপ্টেন নেমো যে এই বিশেষ ঝিনুকটির কথা আগে থেকেই জানতেন, তা তক্ষুনি বোঝা গেলো। ঝিনুকের বিশাল ডালা দুটি বন্ধ হয়ে আসছিলো কিন্তু চকিতে ক্যাপ্টেন নেমো তার ছোরাটা তার ফাকে রাখতেই ভালা দুটি আর পুরোপুরি বন্ধ হতে পারলো না। আর সেই ফাকের মধ্য দিয়ে ভিতরের জিনিশটি দেখেই আমি হতবাক হয়ে গেলুম।

মুক্তো যে কোনো নারকোলের মতো এত বড় হতে পারে, তা আমি নিজের চোখে না-দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারতুম না! নটিলাস-এর সিকেও এত বড়ো মুক্তো আমি দেখিনি। আমি হাত বাড়াতে যেতেই নেমো বাধা দিয়ে ছোরাটা টেনে নিলেন, অমনি ঝিনুকের ডালা দুটি বন্ধ হয়ে গেলো। বছরের পর বছর ধরে এই গোপন গুহায় এইভাবেই বড়ো হয়ে চলবে মুক্তোটা, তারপর একদিন ক্যাপ্টেন নেমো তা সংগ্রহ করে এনে তার বিচিত্রাভবনে সাজিয়ে রাখবেন।

সেই গুহা থেকে বেরিয়ে এসে অনির্দিষ্টভাবে এদিক ওদিক ঘুরছি, হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে টান দিয়ে একটা পাহাড়ের আড়ালে দাড় করিয়ে দিলেন।

একটু দূরেই জলের মধ্যে চলমান একটি ছায়ামূর্তি দেখে তার কারণ বোঝা গেলো। হাঙর; না ওই জাতীয় কোনো হিংস্র সিন্ধু প্রাণী? না, কিছুই নয়। আসলে সে সিংহলের একটি মুক্তো-ডুবুরি, জলের উপরে তার ছোট্ট ডিঙি নৌকো ভাসছে। লোকটা একেকবার নিচে নেমে দ্রুত হাতে ঝুলিভর্তি করে মুক্তো তুলছে, তারপর চট করে উপরে উঠে যাচ্ছে। পরক্ষণেই আবার নতুন ঝুলি নিয়ে আসছে।

হঠাৎ লোকটা যেন কোনো দারুণ ভয়ে আঁৎকে উঠলো। পরক্ষণেই তার মাথার উপরে ভেসে এলো মস্ত একটা রুপোলি ছায়া-হাঙরের পেট। হাঙরের উম্মুক্ত দাতের সারি আর ক্রুর নিষ্ঠুর চোখ দেখেই সে বুঝতে পারলে কেন তাকে সিন্ধুনেকড়ে বলে। প্রথম আক্রমণটা লোকটা কৌশলে এড়িয়ে গেলো বটে, কিন্তু পরের বারেই হাঙরটির ল্যাজের ঝাঁপটে সে উল্টে পড়ে গেলে নিচে। অমনি হাঙরটা তীব্রবেগে ঘুরে নিচে নেমে এলো- এই বুঝি তার ওই চোখা লোভী নিষ্ঠুর পঁতের ফঁাকে লোকটা টুকরো টুকরো হয়ে যায়!

এক লাফে সামনে এগিয়ে গেলেন ক্যাপ্টেন নেমো। হঠাৎ নতুন শত্রু দেখে তার দিকে তেড়ে এলো হাঙরটা। উদ্যত ছোরা হাতে তিনি তার জন্ত অপেক্ষা করতে লাগলেন। যেই রাক্ষুসে মাছটা কাছে এগিয়ে এলো, অমনি চট করে এক পাশে সরে গিয়ে ছোরাটা তিনি আমূল তার পেটের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

কে যেন লাল রঙ ছিটিয়ে দিলে জলে। হাঙরটার একটা পাখনা আঁকড়ে তখনো বারেবারে ছোরা চালাচ্ছেন ক্যাপ্টেন। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁকেও এক ঝাঁপটায় ছিটকে পড়তে হলো-হাঙরটা হা করে তার দিকে নেমে গেলো তৎক্ষণাৎ।

এই বুঝি সব শেষ হয়ে গেলো।

কিন্তু হঠাৎ কোত্থেকে একটা হারপুন এসে বিঁধলো সেই সিন্ধুনেকড়ের হৃৎপিণ্ডে-ক্যাপ্টেন চট করে একপাশে সরে গেলেন।

নেড-নেড ল্যাণ্ডই তার হারপুন ছুঁড়ে ক্যাপ্টেন নেমোকে বাচিয়ে দিলে।

তৎক্ষণাৎ ক্যাপ্টেন নেমে সেই সিংহলী ডুবুরিকে নিয়ে জলের উপর ভেসে উঠলেন। ডিঙির উপরে উঠে অল্প চেষ্টাতেই তার জ্ঞান ফিরে এলো। হঠাৎ জ্ঞান ফিরে পেয়ে এতগুলো অদ্ভুত পোশাকপরা লোককে তার উপরে ঝুকে থাকতে দেখে লোকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। ক্যাপ্টেন নেমো তাকে একখানি মুক্তো উপহার দিলেন।

নটিলাস-এ ফিরে এসে নাবিকদের সাহায্যে এই বিষম পোশাক খুলে ফেলে ক্যাপ্টেন নেমো প্রথম কথাটিই বললেন নেভ-এর উদ্দেশে : ধন্যবাদ, নেড ল্যাণ্ড। তোমাকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই।

শোধবোধ হলল, ক্যাপ্টেন, নেড ল্যাণ্ড বললে, প্রথম ধন্যবাদটা আমারই জানানো উচিত ছিলো।

ক্যাপ্টেনের মুখে সূক্ষ্ম একটু হাসির রেখা খেলে গেলো।

পৃথিবী থেকে, মানবজাতির কাছ থেকে, নিজেকে যিনি অমনভাবে বিচ্ছিন্ন করে এনেছেন, নিজের জীবন বিপন্ন করেও তারই একজন প্রতিনিধিকে তিনি যে কেন বাঁচাতে গেলেন,

তার কোনো উত্তর পাওয়া সত্যি কঠিন। ক্যাপ্টেন নেমো যা-ই বলুন না কেন, তিনি নিজের হৃদয়কে এখনো সম্পূর্ণ হত্যা করতে পারেননি। বাইরে থেকে তাঁকে পাষাণ মনে হতে পারে, কিন্তু আসলে তিনি ঠিক তার উল্টো, এই কথাটি তাঁকে বলতেই ঈষৎ আবেগভরে তিনি বললেন, প্রফেসর, ওই ভারতীয়টি অতি শোষিত ও অত্যাচারিত দেশের অধিবাসী। আর আমিও, শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত, তা-ই থাকব।

এ-কথাব অর্থ কি এই যে তিনি একটি পরাধীন জাতির প্রতিনিধি? আর সেই জন্যেই ওই সিংহলীটির প্রতি তার এত দরদ? না কি আক্ষরিকভাবেই তিনি ভারত নামক উপমহাদেশের অধিবাসী? রহস্যটা মোটেই পরিষ্কার হলো না বটে, কিন্তু এটা বোঝা গেলো এই বিদ্রোহী মানুষটি যে-কোনো পরাধীন জাতির জন্য আত্মবিসর্জন করতে পারে।

নীল সাগর ভূমধ্য

ফেব্রুআরি মাসের নয় তারিখে নটিলাস-এর প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়ে ক্যাপ্টেন নেমোর দেয়া চুরুট টানছি, আর দেখছি লোহিত সাগরের উপর দিয়ে নটিলাস কেমন করে আস্তে ভূমধ্য সাগরের দিকে ভেসে যাচ্ছে, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমো আমার পাশে এসে দাড়ালেন।

মঁসিয় আরোনা, হঠাৎ হাসিমুখে তিনি জিগেস করলেন, জানেন পরশু দিন আমরা ভূমধ্য সাগরে পৌঁছবে?

তাহলে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে আসার জন্য নটিলাসকে বাতাসের চেয়েও দ্রুত ছুটতে হবে।

উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরতে হবে কেন? আফ্রিকার পাশ দিয়েই যে যাব তা কে বললে?

নটিলাস যদি ডাঙার উপর দিয়ে না-যায়--

কেন? ডাঙার নিচে দিয়েও তো যেতে পারে।

নিচে দিয়ে?

লোকে এখন সুয়েজ খাল কাটছে বটে, কিন্তু প্রকৃতি ঠাকরুন অনেক আগেই সে-কাজ সেরে রেখেছেন। সুয়েজের তলা দিয়ে পোর্ট সয়ীদ পর্যন্ত মাটির নিচ দিয়ে একটা সুড়ঙ্গ গেছে, আমি তার নাম করেছি আব্রাহাম সুড়ঙ্গ।

সত্যি? সুড়ঙ্গটা কি দৈবাৎ আপনার চোখে পড়ে যায়?

অবশ্য একটু কাণ্ডজ্ঞানও খাটাতে হয়েছে। ওই সুড়ঙ্গ না-থাকলে আমি লোহিত সাগরে ঢুকতুম না।

সুড়ঙ্গটাকে কীভাবে আবিষ্কার করলেন, জানতে পারি? অবশ্য যদি আপনার কোনো আপত্তি না-থাকে?

ভাগ্য যাদের চিরকালের মতো এক সঙ্গে জড়িয়ে গেছে, তাদের মধ্যে কোনো কথাই গোপন থাকা উচিত নয়। ক্যাপ্টেন নেমে বললেন, সুড়ঙ্গটার খোঁজ পেয়েছিলুম মাছ দেখে।

অর্থাৎ?

লক্ষ্য করেছিলুম যে একই জাতের কতগুলো মাছ ভূমধ্য সাগরে আর লোহিত সাগরে পাওয়া যায় অথচ আমরা জানতুম এই দুই সমুদ্রের কোনো যোগসূত্রই নেই। তাহলে এর এই দুই সমুদ্রে যাতায়াত করে কীভাবে? এ-রকম কোনো সুড়ঙ্গ থাকলে লোহিত সাগর থেকেই তা উত্তরমুখো যাবে, কারণ লোহিত সাগরের। উচ্চতাই বেশি। আমার অনুমান ঠিক কিনা বোঝবার জন্য রাশি রাশি মাছ ধরে ল্যাজে পিতলের আংটি বেঁধে আবার

সমুদ্রে ছেড়ে দিলুম। কয়েক মাস পরে সিরিয়ার কাছে এই আংটি বাঁধা মাছগুলোকেই খুঁজে পেলুম। তখন আর আমার কোনো সন্দেহই রইলো না। ফলে নটিলাস জলের তলায় সরেজমিনে তদন্তে বেরোলো, আর সহজেই সন্ধান পাওয়া গেলো। আপনিও শিগগিরই সুড়ঙ্গটা দেখতে পাবেন, আমি ছাড়া যার হদিশ আর-কেউ জানে না।

পরের দিন সন্ধেবেলায় নটিলাস সুয়েজের কাছে পৌঁছেই জলের তলায় ডুব দিলে।।

সেই আরব্য সুড়ঙ্গ দেখতে পাবার প্রত্যাশায় আমি চঞ্চল ও অধীর হয়ে উঠেছিলুম। বোধহয় আমার চাঞ্চল্য লক্ষ্য করেই ক্যাপ্টেন নেমো জিগেস করলেন, প্রফেসর, আপনি কি আমার সঙ্গে চালকের ঘরে যেতে রাজী আছেন?

এই কথাটিই জিগেস করবো কিনা ভাবছিলুম, কিন্তু কিছুতেই আর সাহস পাচ্ছিলুম না।

তাহলে আসুন।

ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে নিয়ে চালকের খাঁচায় গিয়ে হাজির হলেন। চৌকো একটি ঘর, লম্বা-চওড়ায় ছ-ফুট–মিসিসিপি কিংবা হাডসন নদীর জাহাজের সারেঙের ঘরটা যেমন হয় তেমনি দেখতে। ঘরটার ঠিক মধ্যখানে রয়েছে চাকাটা, চারদিকের দেয়ালে চারটে কাঁচের জানলা, যাতে সারেঙের পক্ষে চারপাশ দেখা সম্ভব হয়।

সারেঙের কামরাটা অন্ধকার, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার চোখ আবছায়ায় অভ্যস্ত হয়ে গেলো। কামরার পিছনে যে লণ্ঠনটা জ্বলছিলো তার আলো এসে পড়েছে জলে, আর ঝলমল করে উঠেছে সিন্ধুতল।।

এবার সুড়ঙ্গের মুখটা খুঁজে বার করতে হবে, বলে বৈদ্যুতিক তারের সাহায্যে ইঞ্জিন-ঘরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন ক্যাপ্টেন নেমো, যাতে একই সঙ্গে নটিলাস-এর বেগ আর দিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। একটি ধাতুনির্মিত হাতলে চাপ দিয়ে চাকার গতিটা অনেক কমিয়ে ফেললেন তিনি।

চুপ করে দাড়িয়ে চোখের সামনেই আধো-আলো আধো-আবছায়ার মধ্যে সুয়েজের তীরের খাড়া পাথুরে দেয়াল দেখতে পেলুম। দিগ,দশিকায় সজাগ চোখ রেখে ক্যাপ্টেন নেমে একের পর এক নির্দেশ পাঠাতে লাগলেন ইঞ্জিন-ঘরে।

রাত সোয়া দশটার সময় ক্যাপ্টেন নেমো এসে নিজেই হাল ধরলেন। হঠাৎ দেওয়াল সরে গিয়ে সামনে গভীর কালো এক বিকট গহবরকে হা করে থাকতে দেখলুম, নটিলাস সেই পাথুরে মুখের ভিতর নিয়ে ঢুকে পড়লো। চারপাশ থেকে প্রবল জলকল্লোল উঠছে— ঢালু বেয়ে লোহিত সাগরের জল ছুটে চলেছে ভূমধ্য সাগরের দিকে, আর তারই জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে থরো থরো, নটিলাস দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো।

টেরচাভাবে আলো পড়ে পাথরের দেয়ালে, মাঝে-মাঝে দেয়ালগুলো যেন দ্রুত এগিয়ে আসে নটিলাস-এর দিকে, আর আমার বুকে যেন দুমদাম করে হাতুড়ির বাড়ি পড়ে। শেষকালে এই পাথরের দেয়ালে প্রচণ্ড দা খেয়ে যদি নটিলাস-এর সলিল সমাধি হয়।

দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটের সময় সারেঙের চাকা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন নেমো, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ভূমধ্য সাগর।

বিশ মিনিটও লাগলো না, প্রবল জলোচ্ছ্বাস নটিলাসকে বহন করে নিয়ে এলো ভূমধ্য সাগরে, সুয়েজ যোজক তার কাছে কোনো বাধা বলেই গণ্য হলো না।

সোনার সিন্দুক

ক্যাপ্টেন নেমো যে কেমন লোক, বোঝ শক্ত। এই বেশ হাসিখুশি, তারপরেই আবার গম্ভীর ও নিজের মধ্যে তন্ময়। যেমন চোদ্দোই ফেব্রুআরিতে তাকে দেখলুম তার সেলুনে গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে আছেন। তার সেই ব্যাকুল, গম্ভীর ও সমাহিত মৃতি দেখে কোনো কথা বলা সংগত বোধ করলুম না। নটিলাস তখন গ্রীসের সমুদ্রে, ক্রীট দ্বীপের পাশে রয়েছে। আর সেই জন্যই হঠাৎ আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছিলো। আমি যখন আব্রাহাম লিঙ্কন-এ আমেরিকা ত্যাগ করে অতিকায় সিন্ধুদানবের বিরুদ্ধে অভিযানে বেরোই, তখন ক্রীটের বাসিন্দারা তুর্কি শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলো। এই বিদ্রোহ কি আদৌ সফল হয়েছে, না কি তা সমূলে উৎপাটিত হয়েছে, তা আমি জানতুম না। সেদিন ক্যাপ্টেন নেমোকে দেখেই কেন যেন এই বিদ্রোহের ফলাফল জানবার জন্য কৌতূহল বোধ করলুম। কিন্তু তার ওই গম্ভীর মূর্তি দেখে কোনো প্রশ্ন জিগেস করার সাহস আর হলো না।

মানুষটিকে যত দেখছি, ততই অবাক হচ্ছি, ততই আমার মূল ধরে টান দিচ্ছেন তিনি। গোপন সাধক বলে মাঝে মাঝে মনে হয় তাঁকে-যেন লোকচক্ষুর আড়ালে কোনো-এক দুর তপশ্চর্যায় লিপ্ত। যুগপৎ সারল্য আর জটিলতার প্রতীক–যাবতীয় বিরোধের সমন্বয়েই যেন তার আশ্চর্য অস্মিতা গড়ে উঠেছে। আমার পরিচিত কোন লোকের সঙ্গেই তার কিছু মেলে না, কোন কিছু না।

হঠাৎ উঠে গিয়ে একটি জানলা খুলে বাইরের চঞ্চল জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন ক্যাপ্টেন নেমো, আর ওই জলের পাশে তাঁকে দণ্ডায়মান দেখে আমার হঠাৎ মনে হলো একমাত্র সমুদ্রের সঙ্গেই বুঝি তার তুলনা হতে পারে। সমুদ্রের মততই অতলস্পর্শী তার ব্যক্তিত্ব—তেমনি রহস্যময় ও জটিল; তেমনি চঞ্চল অধীর ও ক্ষিপ্র, তেমনি শান্ত সুনীল ও দিগন্তচুম্বী; সমুদ্রের মতোই যেন হিংস্র, সমুদ্রের মতোই যেন প্রবল, আবার সমুদ্রের মতোই স্নিগ্ধ-সুষমায় সমাকুল।

হঠাৎ পাশের জানলা দিয়ে তাকিয়ে দেখি জলের মধ্যে একজন ডুবুরি নেমে এসেছে। প্রবল বেগে সাতার কাটছিলো লোকটি, আবার মাঝে-মাঝে নিশ্বাস নেবার জন্যে ভেসে উঠছিলো জলের উপর। তারপরেই আবার ডুব দিয়ে নেমে আসছিলো জানলার কাছে।

ক্যাপ্টেন নেমো দাড়িয়েছিলেন অন্য একটি জানলার কাছে। আমার চিৎকার শুনে এই জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। ডুবুরিটি আরো কাছে এগিয়ে এলো। অবাক হয়ে লক্ষ করলুম, জানলার এ-পাশ থেকে হাত তুলে কী-একটা ইঙ্গিত করলেন ক্যাপ্টেন, উত্তরে লোকটা হাত নেড়ে উপরে উঠে গেলো-আর ফিরে এলো না। এবার আমার দিকে ফিরে তাকালেন ক্যাপ্টেন, বললেন, ভয় পাবেন না। ও হচ্ছে মাটাপান অন্তরীপের নিকোলাস-যদিও সবাই ওকে পেসকে বা মাছ বলে ডাকে। আশপাশের সব কটা দ্বীপ ওর চেনা। অমন সাহসী ডুবুরি বোধহয় আর নেই।

আপনি ওকে চেনেন, ক্যাপ্টেন? কেন চিনবো না, মঁসিয় আরোনা?

এই কথা বলে ঘরের এক কোনায় গিয়ে একটা মস্ত সিন্দুকের ডালা খুললেন ক্যাপ্টেন নেমো। ডালার উপর তামার পাতে নটিলাস-এর নাম লেখা, আর লেখা তার মূলমন্ত্র, চলার মধ্যে চলা। (Mobilis in Mobili.)

সিন্দুকটার ভিতরে রাশি-রাশি সোনার ডেলা সাজানো। এত সোনা তিনি পেলেন কোত্থেকে? তা ছাড়া এখন এত সোনা দিয়ে কীই বা করবেন তিনি?

কোনো কথা না বলে চুপচাপ দাড়িয়ে দেখলুম একটা-একটা করে সোনার ডেলা তুলে তিনি একটি বাক্সে বোঝাই করতে লাগলেন। যখন পুরো বাটা বোঝাই হয়ে গেলো তখন শক্ত তালা লাগিয়ে বাক্সটার উপর আধুনিক গ্রীক হরফে কার যেন ঠিকানা লিখলেন তিনি। তারপর একটা হাতল ধোরাতেই বাইরে ঘুণ্টির আওয়াজ হলো, অমনি চারজন অনুচর এসে অতি কষ্টে বাক্সটাকে টেনে-টেনে সেলুনের বাইরে নিয়ে গেলো। তারপরে কপিকল দিয়ে বাক্সটাকে লোহার সিঁড়ি দিয়ে টেনে তোলার শব্দও পেলুম।

এতক্ষণ পরে বোধহয় হঠাৎ আমাকে নেমোর মনে পড়লো। আপনি কিছু বলছিলেন, প্রফেসর?

কই, না তো।

তাহলে শুভরাত্রি রইলো।

ক্যাপ্টেন নেমো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। আমিও অত্যন্ত কৌতূহলী হয়ে নিজের ঘরে ফিরে এলুম। ওই ডুবুরিটির ইঙ্গিত আর বাক্সভতি সোনার ডেলার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক

আছে কি না, ভাবতে লাগলুম আমি। অনেক রাত্রেও আমি যখন জেগে-জেগে এসম্বন্ধে নানা কথা ভাবছি, তখন নানা আন্দোলন ও আওয়াজ শুনে বুঝলুম নটিলাস ধীরে-ধীরে জলের উপর ভেসে উঠলো। তারপরে প্ল্যাটফর্মে অনেক পায়ের শব্দ শোনা গেলো। আওয়াজ শুনে বুঝলুম নৌকো নামানো হলো সমুদ্রে।

ঘণ্টা দুয়েক পরে আবার প্ল্যাটফর্মে নৌকো টেনে-তোলার শব্দ শোনা গেলো। নটিলাস আবার জলের তলায় ডুব দিলে।

শোনা তাহলে যথা-ঠিকানায় পৌঁছে গেলো? কোন সে ঠিকানা? কার কাছে এত সোনা পাঠালেন ক্যাপ্টেন নেমো?

হিংটিংছট প্রশ্নের মতো এই সব কথা ভাবতে-ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, জানি না। সকালে উঠে দেখি আমরা গ্রীসের উপকূল পিছনে ফেলে এসেছি।

যে প্রবল বেগে নটিলাস ভূমধ্য সাগর পেরিয়ে এলো, তাতে মনে হলো ক্যাপ্টেন নেমো কোনো কারণে বোধহয় এই অঞ্চলকে পছন্দ করেন না। হয়তো সমুদ্রের এই অঞ্চলে অনেক দুঃখের স্মৃতি জড়ানো আছে, তাই নটিলাস-এর গতি তিনি মন্থর করতে চাননি। শুধু সিসিলির কাছে একটু সময় বোপাহাড়ের প্রাচুর্যের জন্য মন্থর হয়েছিলো গতি, তারপর আবার জিবরাল্টার প্রণালীতে পড়েই গতি অনেক বৃদ্ধি পেলে। যাবার সময় কেবল চকিতে একটুক্ষণের জন্য দেখা গেলো হারকিউলিসের সেই প্রাচীন মন্দির, এখন যা সিন্ধুতলের শ্যাওলায় সমাকীর্ণ। আর

তারপরেই আমরা অতলান্তিক মহাসাগরে এসে পৌঁছোলুম।

সিন্ধুতলের কোষাগার

নটিলাস আমাদের যত স্বাচ্ছন্দ্যই দিক, তবু বন্দী তো। ফলে নেড ল্যাণ্ড যখন। পলায়নের পরিকল্পনা করলে, আমাকে রাজী হতেই হলো।

মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টায় ভূমধ্য সাগর অতিক্রম করে আমরা তখন অতলান্তিক মহাসাগরে এসে পড়েছি, ইস্পাহানের উপকূল ধরে আস্তে জলের তলা দিয়ে চলেছে নটিলাস। ঠিক হয়েছে রাত নটার সময় নটিলাস-এর নৌকোয় করে আমরা পালাবো।

এই কদিন ক্যাপ্টেনের সঙ্গে দেখা হয়নি। নটিলাস ছেড়ে যাবার আগে শেষবার সব ভালো করে দেখে যাবার ইচ্ছে হলো খুব। তাই রাত আটটার সময় আমি সন্তর্পণে ক্যাপ্টেন নেমোর ঘরের কাছে গিয়ে দাড়ালুম। ভিতর থেকে কোনো শব্দ আসছে না দেখে সাহস সঞ্চয় করে আস্তে একটু ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেলো।

তপস্বীর শাদাশিদে ঘরের মতো এই নিরাভরণ ঘরটিতে আমি আগেও গেছি। দেয়ালে নানা দেশের নেতাদের ছবি ঝুলছে; পোল্যাণ্ডের বীর নেতা কোসকিয়ুস্কো আয়ারল্যাণ্ডের ডানিয়েল ও কনেল, আমেরিকার জর্জ ওয়াশিংটন, আব্রাহাম লিঙ্কন আর জন ব্রাউন। এরা প্রত্যেকেই স্বদেশের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। ক্যাপ্টেন নেমোর রহস্যের সূত্র কি তবে এই ছবিগুলি? ইনিও কি দুর্ভাগা দেশের লাঞ্ছিত ও নিপীড়িত মানুষদের জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন? কোন সে আত্মীয়তার বাঁধন, যা বোটৎসারিস, ও কনেল, আব্রাহাম লিঙ্কনের সঙ্গে তাঁকে একসূত্রে বেঁধে রেখেছে? আমেরিকার সাম্প্রতিক

গৃহযুদ্ধের কোনো নায়ক ইনি? এই শতাব্দীর বৃহত্তম বিপ্লবের কোনো নেতা কি তিনি আসলে?

হঠাৎ এমন সময়ে ঢং-ঢং করে আটটা বাজলো ঘড়িতে। অমনি যেন আমি মুছ থেকে জেগে উঠলুম। মনে পড়লো যে এ-ঘরে আসলে ঢুকেছিলুম দিগদর্শিকা দেখে আমাদের গতিপথ নির্ধারণ করতে। তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে ধড়াচুড়ো পরে তৈরি হয়ে নিলুম আমি, নটিলাস-এরই দেয়া নাবিকের পোশাকে নিজেকে সজ্জিত করে নিলুম।

পালাবার মুহূর্ত যত এগিয়ে আসতে লাগলো আমার বুকের স্পন্দনও ততই যেন বেড়ে চললল। সমস্ত নটিলাস-এ কোনো সাড়া শব্দ নেই, কেবল একটা ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন ভেসে আসছে; আমার হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনের সঙ্গে যন্ত্রের এই গুঞ্জন যেন মিশে যাচ্ছে। প্রতি মুহূর্তে আমার উৎকর্ণ অস্তিত্ব প্রতীক্ষা করতে লাগলো চ্যাঁচামেচি ও হট্টগোলের; এই বুঝি নেড ল্যাণ্ড পালাবার চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়।

ন-টা বাজতে মাত্র কয়েক মিনিট বাকি, এমন সময় হঠাৎ যেন বুকের ভিতরটা ফাকা করে দিয়ে ইঞ্জিনের মৃদু গুঞ্জন মিলিয়ে গেলো। ছোট্ট ধাক্কা দেখে বুঝলুম নটিলাস আস্তে-আস্তে গভীর সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। তাহলে কি আমাদের পলায়নের পরিকল্পনা আর গোপন নেই?

এমন সময়ে ঘরের দরজা খুলে হাসিমুখে ভিতরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নেমো। এই যে, প্রফেসর, আপনাকেই খুঁজছিলুম। ইস্পাহানের ইতিহাস আপনি জানেন তো?

এমন অবস্থায় কাউকে তার স্বদেশের ইতিহাসের কথাও জিগেস করলে সে কোনো উত্তর দিতে পারতো কিনা সন্দেহ।

আমাকে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে নেমো আবার জিগেস করলেন, কী? জানেন নাকি?

যৎসামান্য, কোনো রকমে এই কথাটিই বলতে পারলুম শুধু।

ঠিক পণ্ডিতদের মতোই জবাব, বললেন ক্যাপ্টেন, পণ্ডিত বলে তারা কিছুই জানে না—বসুন, আপনাকে ইস্পাহানের ইতিহাসের একটা কাহিনী শোনাই।

ডিভানের উপর হেলান দিয়ে বসলেন ক্যাপ্টেন নেমো। তারপর গুনগুন করে বলতে শুরু করলেন ইস্পাহানের জাতীয় সংগ্রামের দীর্ঘ কাহিনী।

সত্যি দীর্ঘ কাহিনী শুনিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। ইংরেজ ওলন্দাজ আর আলেমান জাতিপুঞ্জের সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য রাজা চতুর্দশ লুই-এর নেতৃত্বে ফ্রান্স ইস্পাহানের সঙ্গে মৈত্রী রচনা করলে। কিন্তু যুদ্ধের জন্য যেবিপুল অর্থ চাই, তা কে জোগাবে। দক্ষিণ আমেরিকায় ইস্পাহানের তখন অঢেল ঐশ্বর্য। মায়া আর ইনকাদের সোনারুপোয় অনেক ইস্পাহানি জাহাজ বোঝাই করা হলো, আর তেইশটা ফরাশি যুদ্ধজাহাজ তাদের পাহারা দিয়ে নিয়ে চললো ক্যাডিজের দিকে। খবর পেয়ে ইংরেজ নৌবাহিনী ক্যাডিজ অবরোধ করে পথ আটকে বসে রইলো। ফলে বিপদ এড়াবার জন্য ফরাশি সেনাধ্যক্ষ আর ইস্পাহানি অধিনায়ক পরামর্শ করে সোনাভর্তি জাহাজ নিয়ে চললেন ভিগো উপসাগরে, কিন্তু কোনো কারণে জাহাজ থেকে মাল খালাশ করতে বড্ড

দেরি করে ফেলেছিলেন তাঁরাসেই সুযোগে ইংরেজ বাহিনী এসে তাদের আক্রমণ করে বসলো। নীল জল লাল হয়ে গেলো সেই দারুণ যুদ্ধে, আর ফরাশি সেনাধ্যক্ষ যখন দেখলেন ইংরেজ বাহিনী সঙ্গে কিছুতেই এটে-৩ঠ যাবে না, তখন তার আদেশে গোলাবারুদ দিয়ে সোনারুপোভরা ইস্পাহানি জাহাজগুলো জলে ডুবিয়ে দেয়া হলো। এই অতুল ঐশ্বর্য শত্রুর হাতে পড়ার চেয়ে সলিল-সমাধি হওয়া ঢের ভালো।

সাল-তারিখ-সংবলিত এই মস্ত গল্প শেষ হলো, কিন্তু আমি ঠিক বুঝতে পারলুম না ক্যাপ্টেন নেমো হঠাৎ আমাকে এই কাহিনী শোনালেন কেন। তো কী! আমি জিগেস করলুম।

মঁসিয় আরোনা, ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, নটিলাস এখন এই ভিগো উপসাগরেই নেমে পড়েছে।

ক্যাপ্টেন নেমো উঠে দাড়িয়ে একটি জানলার পাশে নিয়ে গেলেন আমাকে। জানলা দিয়ে দেখলুম ডুবুরির পোশাক পরে নাটলাস-এর মাল্লার বালি খুঁড়ে তোবড়ানো, ভাঙাচোরা, শ্যাওলা-পড়া বাক্স উদ্ধার করছে। অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে অজয় জাহাজের ধ্বংসাবশেষ। সেই ভাঙা বাক্সগুলো থেকে রাশিরাশি সোনারুপপার ডেলা, পুরোনো ইস্পাহানি মোহর ও মূল্যবান দীপ্ত পাথর ছড়িয়ে পড়লো সিন্ধুতলে, আর নটিলাস-এর মাল্লারা তা দিয়ে বোঝাই করতে লাগলো মস্ত সব সিন্দুক। সিন্ধুতলের বলরাশির উপর তারার মতো ঝিকিয়ে-ওঠা এই অকল্পনীয় ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে সুব স্পষ্ট বুঝতে পারলুম আমি। শূন্য সিন্দুক আবার ভরে নেবার জন্যই ভিগো উপসাগরে এসেছে নটিলাস–ইনকাদের অতুল ঐশ্বর্যের অধীশ্বর এখন এই মানুষটিই।

হাসিমুখে আমার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন ক্যাপ্টেন নেমো। এখন বুঝতে পারছেন ততা কেমন করে আমি ক্রোড়পতি হয়েছি?

বুঝলুম। কিন্তু এত ঐশ্বর্য, সব কিনা এমনিভাবে নষ্ট হচ্ছে–কোনো কাজেই লাগছে না?

বলতে-বলতেই বুঝতে পারলুম অজান্তে আমি ক্যাপ্টেন নেমোকে আঘাত করে বসেছি।

নষ্ট হচ্ছে? আহত বাঘের মতো রুষ্ট স্বরে বলে উঠলেন নেমো, আপনি কি ভাবছেন এত কষ্ট করে এই সম্পদ আমি উদ্ধার করছি নষ্ট করার জন্য, নিজের ভোগের জন্য? আমি যে এই ঐশ্বর্যের সদ্ব্যবহার করছি না, তা আপনাকে কে বললে? আপনি কি মনে করেন আমি খবরটুকুও রাখি না পৃথিবীর কোথায়, কোন কোন দেশে, মানুষ নিপীড়িত লাঞ্ছিত ও নিগৃহীত হচ্ছে? এটা কি কিছুতেই বোঝেন না যে–

হঠাৎ ক্যাপ্টেন নেমো থেমে গেলেন। বোধ হয় এত কথা তিনি বলতে চাননি। বোধ হয় এত উত্তেজিত না-হলে এ-সম্বন্ধে কোনো কথাই তিনি বলতেন না। কিন্তু আমি বুঝতে পেরেছিলুম।

সমুদ্রের তলায় এই স্বাধীন নিঃসঙ্গ জীবন বেছে নেবার পিছনে যে কারণই থাক না কেন, ক্যাপ্টেন নেমো যে এখনো মানুষেরই সন্তান, এই তথ্য আমার অগোচর রইলো না। এখনো মানবজাতির দুঃখে ও লাঞ্ছনায় তাঁর বুক কাঁদে, এখনো অত্যাচারিত দীন জাতিদের উদ্দেশে আর অঢেল ঐশ্বর্য ব্যয় হয়। আর অমনি আমি বুঝতে পারলুম বিপ্লব-

জ্বলা ক্রীট দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় কাদের উদ্দেশে তিনি ওই সোনাভরা সিন্দুক পাঠিয়েছিলেন।

লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ

পরের দিন, উনিশে ফেব্রুয়ারি, সকালবেলায় নেড ল্যাণ্ড সবেগে আমার ঘরে এসে ঢুকলো। তারই প্রত্যাশা করছিলুম আমি। বড় হতাশ দেখালো তাকে।

হলো তো! হতাশভাবে সে বললে আমায়।

তা কী করবে, বলো? ভাগ্য বিরূপ ছিলো কাল।

কিন্তু ঠিক ওই সময়টাতেই কিনা ক্যাপ্টেন জলের তলায় নামলো।

হ্যাঁ, নেড। ব্যাংকে গিয়ে টাকা তোলা দরকার ছিলো তাঁর।

ব্যাংকে?

ব্যাংক ছাড়া আর কী বলি? কোনো ব্যাংকের লোহার সিন্দুকের চেয়েও সমুদ্রের তলা অনেক বেশি নিরাপদ তাঁর কাছে। আর এখানেই তিনি তার সব সম্পদ জমা রাখেন। এই বলে কাল রাতের সব ঘটনা আমি তাকে খুলে বললুম। এত কথা তাকে বলার উদ্দেশ্য ছিলো এই যে যদি তাতে নেডের মতি ফেরে, যদি এর পর ক্যাপ্টেন নেমো সম্বন্ধে সে আর বিরূপ না-হয়। কিন্তু সব শুনে নেড কেবল আপনোস করে বলতে লাগলো যে হায় রে!-সে কিনা ওই ইনকাদের সোনা আনতে যেতে পারলে না।

ঠিক আছে। কোনো পরোয়া নেই, যাবার আগে নেড বললে, পরের বারে ঠিক পালাবো, দেখবেন। দরকার হলে আজ রাতেই পালাবো

নটিলাস কোন দিকে যাচ্ছে, জানো?

না।

আচ্ছা, দুপুরবেলা ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আমি জেনে নেবো।

নেড কোনসাইলের খোঁজে চলে গেলো।

পালাবার পরিকল্পনা কিন্তু সেদিন তাকে বাদ দিতে হলো। প্রথমত আশপাশে কোথাও ডাঙার চিহ্ন দেখা গেলো না; উপরন্তু আকাশে মেঘের আনাগোনা দেখে ঝড়ের সম্ভাবনাটা আর আগোচর রইলো না। নেড রাগে এমন ভাব করতে লাগলো যে পারলে সে যেন মেঘেদের ছিড়ে খায়। আমি কিন্তু গোপনে বলি যে মেঘ দেখে আমার অতটা দুঃখ হয়নি—পালাবার জন্য আমি আর অতটা উৎসুক ছিলুম না।

ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে দেখা হলো রাত এগারোটায়। আমাকে দেখেই জিগেস করলেন আমি ক্লান্ত কিনা। আমি মাথা নাড়তেই সরাসরি কাজের কথা পাড়লেন নেমে। মঁসিয় আরোনা, আপনি তো কখনো রাত্রিবেলায় সমুদ্রের নীচে বেরোননি। চলুন না, একটু ঘুরে আসা যাক। অবশ্য খুব ক্লান্ত লাগবে পরে, একথা আগে থেকেই বলে রাখি কারণ প্রথমত আমাদের অনেকটা পথ হাঁটতে হবে, উঠতে হবে এমন কি একটি পাহাড়ের চুড়োয়, দ্বিতীয়ত রাস্তাঘাট তেমন ভালো নয়–অনেকদিন মেরামত হয়নি কিনা।

আপনার কথা শুনে দ্বিগুণ কৌতূহল জাগছে। চলুন, যাই।

ডুবুরি-পোশাক পরে নিলুম দুজনে, সঙ্গে নিলুম লোহার আংটা লাগানো লাঠি। কিন্তু দেখি বৈদ্যুতিক লণ্ঠন নেবার কোনো উদ্যোগই করলেন না ক্যাপ্টেন নেমো? জিগেস করতেই বললেন, ও-লণ্ঠন আমাদের কোনো কাজেই লাগবে না।

আমরা দুজনেই কেবল রাতের সিন্ধুতলে বেড়াতে বেরোবো–নেমো সঙ্গে কোনো অনুচর নিলেন না, বা নেড ও কোনসাইলকেও নেবার কোনো প্রস্তাব করলেন না। আমরা যখন সমুদ্রতলে পা দিলুম তখন রাত বারোটা বাজে। অনেক দূরে কোথায় যেন সমুদ্রের তলায় একটা লালচে আলো জ্বলছে, সেই দিকে আঙুল তুলে দেখালেন ক্যাপ্টেন প্রথমে, তারপর ওই লাল আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন। আমিও তার পাশাপাশি হাঁটতে লাগলুম।।

ওই লোহার লাঠিটা কেন সঙ্গে নিতে হয়েছিলো, হাঁটতে গিয়ে তার কারণ বেশ স্পষ্টই বোঝা গেলো। সামুদ্রিক গুল্ম আর শৈবালে বারে বারে পা পিছলে যাচ্ছিলো, হাতের লাঠিতে ভর দিয়ে সামলে নিলুম প্রতিবারেই। এই পিছল উদ্ভিজ্জ সত্ত্বেও মনে হলো পায়ের তলার পাথুরে মাটির মধ্যে যেন কোনো সচেতন প্রকল্প রয়েছে, যেন নিসর্গসুন্দরীর স্বাভাবিক সৃষ্টি নয়, কারো পরিকল্পনা অনুসারেই রচিত ও বিস্তৃত। মধ্যে-মধ্যে মনে হলো আমার শিশের জুতোর তলায় রাশিরাশি হাড়গোড় গুড়িয়ে যাচ্ছে শব্দ করে।

ক্রমশ পিছনে নটিলাস-এর আলো যতই ক্ষীণ ও দূরবর্তী হয়ে এলো, সামনের সেই লাল দীপ্তিও যেন ততই উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগলো। আরো খানিকটা এগোবার পর বুঝতে

পারলুম ওই আরক্তিম আলোর উৎস হলো সামনের একটি পাহাড়ের চুড়ো। রাত যখন প্রায় একটা বাজে, তখন আমরা সেই পাহাড়ের পাদদেশে এসে দাঁড়ালাম।

এখানে সামুদ্রিক গাছপালা গজিয়েছে নিবিড় ও ঘন-ভাবে, আর সেই ধন অরণ্যের মধ্যে দিয়েই পথ করে নিয়ে এগোতে লাগলেন ক্যাপ্টেন নেমো। সবই যেন তাঁর অতি চেনা; একটুও ইতস্তত না করে কোনো রকম দোটানায় না পড়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন! দু পাশে তাকিয়ে দেখলুম, সত্যি, পাইন গাছের জঙ্গল চলে গেছে সারিবদ্ধভাবে-পচে গেছে গাছগুলো, কোনো সবুজের চিহ্ন নেই, না পাতা, না অন্য কিছু; সোজা পঁড়িয়ে আছে তারা, কয়লার খনির মধ্যে যেমনভাবে দূর অতীতের গাছের প্রতিভাস দেখা যায়—আর ডালপালার মধ্য দিয়ে রঙবেরঙের বিচিত্র মাছের দল সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে-যেন পাখি উড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর বনে।

জঙ্গল যেখানে শেষ হলো পাহাড়ের চুড়ো সেখান থেকে বেশকিছু ফুট দূরে; এবড়ো-খেবড়ো বন্ধুর পার্বত্যপথ ধরে আমরা উঠতে লাগলুম। কালো-কালো গর্তের মধ্যে, আনাচে-কানাচে, ঘুলঘুলির মতো পাহাড়ের ফাটলে কত সিন্ধুদানবের উজ্জ্বল চক্ষু দেখতে পেলুম, তাদের নড়াচড়ার শব্দ কানে এলো কর! পায়ের তলা থেকে কতবার সরে গেলে বিকট দাঁড়-ওলা কাঁড়া আর অতিকায় চিংড়ি। নেমে দৃকপাত না-করে সোজা ওই চুড়োর দিকে এগিয়ে চললেন।

পাহাড়ের চুড়োয় পৌঁছে যে-আশ্চর্য দৃশ্য চোখের সামনে উন্মোচিত হলো তা আমার চিরকাল মনে থাকবে। সারা অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে আছে অগুন্তি প্রাসাদের ভগ্নপ —সবই কোনো পুরাকালীন মানুষের কীর্তি। শ্যাওলা-পড়া গুল্মেভরা প্রাসাদ আর মন্দিরগুলো

চিনতে আমার সত্যি অনেকক্ষণ লাগলো। মানে কী এই ভগ্নস্তূপের? এ কোন জনপদ এই সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে? এই বিশাল হর্মরাজি কারা গড়েছিলো, কোন যুগে?

বহু যুগের ওপার হতে যেন জলমর্মর ভেসে এলো। আমি যা ভাবছি সত্যি কি তবে তাই? সাগ্রহে ক্যাপ্টেন নেমোর হাতটা চেপে ধরলুম আমি; নেমো কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ না করে শুধু আরো এগিয়ে চললেন। কিছুক্ষণ পরে আরো-উচু একটা চুড়োয় ওঠবার পর সেই কোন দুরন্ত রক্তচক্ষুর মত লাল আলোর উৎস চোখে পড়লো আমার : প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচেই পাহাড় হাঁ করে আগুন ওগরাচ্ছে–আগ্নেয়গিরির জ্বালামু খি দিয়ে তপ্ত লাল লাভার স্রোত গলগল করে বেরিয়ে আসছে। কোনো শিখা নেই—অক্সিজেন না-থাকলে শিখা থাকে না। শুধু লাল গনগনে সেই তরল আগুন পাহাড়ের গা বেয়ে জলের মধ্যে গড়িয়ে পড়েছে।

মহাকালের এই প্রচণ্ড রক্তচক্ষু আর এই জনপদের ভগ্নস্তুপ একটা জাতির পুরো ইতিহাস বলে দিচ্ছে। দূরবিস্তৃত সমতল ভূমি জুড়ে এই পাহাড়ের তলায় যেসুন্দর নগর গড়ে উঠেছিলো, সভ্যতার কোলাহল জেগেছিলো যেখানে একদা, এখন সেখানে ছাদ, মন্দিরের চুড়ো, মস্ত থামগুলির মধ্য দিয়ে লাভার স্রোত বয়ে যাচ্ছে। দূরে একটা বন্দরের নিদর্শনও চোখে পড়লো। এখানে একদিন কত পালতোলা জাহাজ ফেনিল জলের উপর দিয়ে ভেসে যেতো।

আমার মাথার ভিতরটায় যেন আবর্ত খেলে গেলো। কোথায় আছি আমি, কোনখানে? আমার উন্মাদনা এতই প্রবল হয়েছিলো যে শিরস্ত্রাণ খুলে ফেলে জিগেস করতে যাচ্ছিলুম

আমি, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে বাধা দিলেন। নিচু হয়ে খড়িমাটি তুলে তিনি সেই হারানো জগতের পাথরের গায়ে ছোট্ট একটি নাম লিখলেন : আটলান্টিস।

যেন তড়িৎ খেলে গেলো আমার মধ্যে। চকিতে পরিষ্কার হয়ে গেলো এই লুপ্ত নগরীর রহস্য। যাকে এতকাল কিংবদন্তি বলে ভেবেছি, ওরিগেন, ইয়ানসি, দ্যানভিল, নান্টেন, হুগোল্ট যার কথা বিশ্বাস করেননি, প্লারে সেই আটলান্টিস নগরী, ততয়োগোম্পসের সেই বিখ্যাত দেশ। শৌর্যে বীর্যে একদিন যারা উন্নতির চরম শিখরে উঠেছিলো, প্রাচীন গ্রীকদের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও যারা একদিন পেছপা হয়নি, রাতারাতি এক প্রলয়ংকর ভূমিকম্পে তারা সমুদ্রগর্ভে তলিয়ে গেলো, সমস্ত কীর্তিধ্বজা সমেত নিঃশেষে হারিয়ে গেলে পৃথিবীর উপর থেকে।।

আর আমি, সামান্য পিয়ের আরোনা, পারী বিচিত্রাভবনের কর্মচারী—আমি কি না এই লুপ্ত মহাদেশের বুকে দাঁড়িয়ে আছি এখন? যেন বহুযুগের ওপারের কোনো হারানো দেশের স্বপ্নে আচ্ছন্ন হয়ে গেলুম আমি। আর ক্যাপ্টেন নেমো সারাক্ষণ শ্যাওলাজমা একটি পাথরের গায়ে হেলান দিয়ে পাথরের মতোই নিশ্চল দাড়িয়ে রইলেন। কী স্বপ্ন দেখছেন এই কবিমানুষটি এখানে? তিনি কি সেই হারানো মানুষদের কাছ থেকে জেনে নিতে চাচ্ছেন মানবভাগ্যের পরম রহস্য? যেমানুষটি তার সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে আধুনিক পৃথিবীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, সে কি বারেবারে এখানে এসে অতীতের ছায়ার মধ্যে নিজেকে ফিরে পায়!

প্রায় একঘণ্টা ছিলাম সেখানে। সারাক্ষণ পায়ের তলায় মাটি কাপিয়ে সেই গনগনে রক্তিম তরল আগুন বয়ে গেলে এই হারানো মহাদেশের উপর দিয়ে। আর তারপর

www.bengaliebook.com

জলের উপর উঠে এলো কম্পমান পাণ্ডুর চাঁদ। চাঁদ ঠিক নয়, ঈদের উজ্জ্বল প্রতিভাস শুধু। আর চাঁদের সেই ছায়ার মধ্যেই আমরা ফিরে চললুম।

যখন ক্লান্ত অবসন্ন দেহটিকে নটিলাস-এ টেনে তুললুম, তখন আলো হয়ে এসেছে পুবদিক।

সূর্য উবে এবার।

লক্ষ্য : অবাচী

ক্রমাগত দক্ষিণ দিকে ছুটে চলতে থাকে নটিলাস, লক্ষ্য তার অবাচী। আমরা পেরিয়ে এলুম সারাগোসা সাগর, পেরিয়ে এলুম তিমিজিলের দেশ, সিন্ধুতলের কয়লাখনি। ধীরে-ধীরে তুহিন অবাচীর দিকে এগোচ্ছি আমরা।

পঞ্চান্ন অক্ষরেখার কাছেই জলের উপর বরফের চাঙড় ভেসে থাকতে দেখে ছিলুম, ষাট অক্ষরেখার কাছে এসে দেখি সামনে এগোবার পথ বন্ধ। হঠাৎ কে যেন আঙুল তুলে চঞ্চল সমুদ্রকে তিষ্ঠ বলে থামিয়ে দিয়েছে এখানে, শুরু হয়ে গেছে ধূ-ধূ বরফের রাজ্য–শুভ্র, নিরেট, দিগন্তবিসারী।

ইচ্ছে করলেই নটিলাস-এর মুখ ঘুরিয়ে নেয়া যেতো, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমে কিছুতেই দমে যাবার মানুষ নন। খুঁজে খুঁজে ঠিক একটা সংকীর্ণ পথ বার করলেন তিনি, তারপর তার ভিতর দিয়েই আশ্চর্য কৌশলে নিজে চালিয়ে নিয়ে যেতে লাগলেন নটিলাস। চারপাশে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই-ঠাণ্ডা হিম শাদা মরুভূমি : উয়ে আছে দিগন্ত পর্যন্ত স্তব্ধ নিশ্চল পরিবর্তনহীন এই শূন্যতার সঙ্গে কিছুরই বোধ হয় তুলনা হয় না। বৈদ্যুতিক চুল্লি জ্বালিয়ে নটিলাস-এর ভিতরটা গরম রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, পশুলোমের মোটা পোশাক চাপিয়েছিলুম আমরা গায়ে, তবু তারই মধ্যে ঠাণ্ডা তার লোভী দাত বসাতে চাচ্ছিলো বারেবারে।

মার্চ মাসের ষোলো তারিখে আমরা কুমেরু বলয় পেরিয়ে এলুম। নির্ভয় ক্যাপ্টেন নেমোতুহিন প্রাচীরের মধ্য দিয়ে চালিয়ে নিয়ে এলেন নটিলাস কোনোদিকে দৃকপাত না-করে পাৎলা বরফের স্তর ভেদ করে এগিয়ে চললেন সামনে; যে-পথ দিয়ে আমরা আসছি, সে-পথ দেখতে দেখতে জমে বরফ হয়ে যাচ্ছে–এখন আর ইচ্ছে হলেও ফেরবার পথ রুদ্ধ। এগোবার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হলে আঠারোই মার্চ-কোনোক্রমেই আর এগোনো সম্ভব হলো না নটিলাস-এর পক্ষে। মস্ত সব তুহিন পাহাড় উঠেছে সামনে, আকাশ আড়াল করে স্তব্ধ ও হিম তারা দাঁড়িয়ে আছে, তাপমাত্রা নেমে এসেছে শূন্য থেকে পাঁচ ডিগ্রি নিচে। চারপাশের বরফের মধ্যে আমরা বন্দী হলুম এতদিনে, যেন আস্ত গিলে ফেলেছে আমাদের বরফেরা। এতদিন হাঁ করে ছিলো বরফের দেশ, এইবার আস্তে আস্তে আমাদের জঠরে পুরে ফেলেছে।

এটা কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর গোয়ার্তুমি। বেপরোয়াভাবে এই বরফের মধ্য দিয়ে না-এলেই হতো!

আমি বড় বিমর্ষ আর মলিন হয়ে পড়েছিলুম, তাই ক্যাপ্টেন নেমো আমাকে জিগেস করলেন, এই যে মঁসিয় আরোনা, কী ভাবছেন অমন গম্ভীরভাবে?

ভাবছি সামনে যাওয়ার পথ তত বন্ধই, এবার ফিরে যাবার পথ পেলেই হয়তারও তো কোনো চিহ্ন দেখছি না।

নটিলাসকে অতটা অসহায় ভাববেন না, প্রফেসর, বিদ্রুপের হাসি খেলে গেলো ক্যাপ্টেনের মুখে, আমার তো ইচ্ছে একেবারে কুমেরুতে গিয়ে আমি।

কুমেরুতে? কিছুতেই আর অবিশ্বাস চেপে রাখতে পারলুম না আমি।

হ্যাঁ, কুমেরুতে-পৃথিবীর দক্ষিণতম বিন্দুতে যেখানে এখনো কোনো মানুষ পদার্পণ করেনি।

তাহলে কি দক্ষিণ মেরু আবিষ্কার করেছেন নাকি আপনি?

না, এখনো করিনি-তবে আমি আর আপনি, আমরা দুজনে মিলে করবো। বরফের বাধা কোনো বাধাই নয়। আমরা এই বরফের তলা দিয়েই চলে যাবে।

তলা দিয়ে?

নিশ্চয়ই। এটা তো জানেন যে বরফের একভাগ জলের উপর সে, আর তিনভাগ থাকে জলের তলায়। সামনের ওই বরফের পাহাড়গুলো যদি তিনশো ফুট উচু হয়, তাহলে জলের তলায় রয়েছে নশো ফুট—তার তলা দিয়ে গেলেই তত হলো। আপনি তো এতদিনে এটা জেনেছেন যে নটিলাস-এর পক্ষে সমুদ্রের আরো-তলা দিয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়।

তা ঠিক।

অবশ্যি কোনো অসুবিধে যে নেই, তা বলি না। কতদিন জলের তলায় থাকতে হবে, তা জানি না। সঞ্চিত বাতাস ফুরিয়ে যাবার পরেও যদি কুমেরুবিন্দুতে ওঠবার পথ না-পাই, তাহলে শ্বাস রোধ হয়ে মরবো আমরা সবাই।

তক্ষুনি নশো ফুট নিচে নামার আয়োজন শুরু হয়ে গেলো। নাবিকেরা কুড়ুল নিয়ে বেরিয়ে এলো বাইরে, চারপাশে বরফ কাটতে লাগলো তারা, আর চাড় দিয়ে দিয়ে একটু একটু পথ করে নিচে নামতে লাগলো নটিলাস। নশো ফুট নামবার পর জল পাওয়া গেলো, কিন্তু নটিলাস নামতে লাগলো আরো নিচেকারণ এর পরে কত ফুট উঁচু বরফের পাহাড় আছে, কে জানে। প্রায় আড়াই হাজার ফুট নিচে নেমে আসার পর আবার শুরু হলো এগিয়ে যাওয়া।

পরের দিন উনিশে মার্চ নটিলাস-এর গতি কমে আসছে দেখে বোঝা গেলো জাহাজ এবার ধীরে ধীরে উপরে ওঠবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ কিসের সঙ্গে যেন ভীষণ ধাক্কা লাগলো নটিলাস-এর অত বড়ো জাহাজটা থরথর করে কেঁপে উঠলো। বুঝলুম উপরে উঠতে গিয়ে বরফের গায়ে ঘা খেলো নটিলাস। সর্বনাশ! দু-হাজার ফুট বরফ ভেদ করে উপরে ওঠার ক্ষমতা তত নটিলাস-এর নেই-তা–হলে এই তুহিন জলেই তার সমাধি হবে। জাহাজ কিন্তু তবু নির্বিকারভাবে দক্ষিণ মুখে চললল, তারপর আবার আরেক ধাক্কা লাগলো বরফের সঙ্গে। এমনি করে বারেবারে ধাক্কা মারতে মারতে এগোতে লাগলো নটিলাস, পরীক্ষা করে দেখতে চাইলো বরফের স্তর কোথায় পাৎলা হয়ে এসেছে, কোথায় সে ধোলা সমুদ্রে ভেসে উঠতে পারবে। সারা রাত দুশ্চিন্তায় কেটে গেল আমার; যদি বরফের স্তর পাৎলা না-হয়, তাহলে? কিন্তু সকালবেলাতেই ক্যাপ্টেন নেমে এসে সুখবরটা দিয়ে গেলেন আমাকে, খোলা সমুদ্রে এসে পড়েছি।

প্ল্যাটফর্মে ছুটে এলুম। সত্যি, খোলা সমুদ্রই! যদিও ইতস্তত বরফের চাঙড় ছড়িয়ে আছে আশপাশে, তবু শান্ত নীল জলের উপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে নটিলাস। আকাশে পাখির গান, জলে খেলা করছে মাছের ঝাঁক, নটিলাস-এর চাকার শব্দ উঠছে ছলে লো। কে

বলবে যে ওই বরফের প্রাচীরের আড়ালে এমন একটি স্পন্দমান সপ্রাণ জগৎ লুকিয়েছিল!

আমার বুকের স্পন্দন বেড়ে গেলো। মেরুদেশে এসে পড়েছি তাহলে!

এখনো তা বলি না। ক্যাপ্টেন নেমো বললেন, সূর্য উঠলে দুপুরবেলা কম্পাস দেখে নটিলাস-এর অবস্থান স্থির করব।

ধুসর আকাশের দিকে তাকিয়ে বললুম, এই কুয়াশার মধ্যে সূর্যের দেখা পাবেন বলে ভাবছেন?

যতটুকু পাই তাই যথেষ্ট।

মাইল দশেক দূরে ছোট্ট একটা দ্বীপ দেখতে পেলুম আমরা। নটিলাস এর নৌকোয় করে ক্যাপ্টেন নেমে আমাদের দ্বীপে নিয়ে গেলেন। নৌকো তীরে ভিড়তেই কোনসাইল লাফিয়ে নামতে যাচ্ছিলো, আমি বাধা দিয়ে বললুম, ক্যাপ্টেন নেমে, আপনি আগে নামুন। এখানে সর্বপ্রথম পদার্পণ করার গৌরব আপনারই প্রাপ্য।

ক্যাপ্টেনের পিছন পিছন আমরাও নামলুম, কিন্তু দুপুর বারোটার সময়ও কুয়াশা ও ঘন বাষ্প ছিঁড়ে সূর্য দেখা দিলো না। তাই দ্বীপটার সঠিক অবস্থান নাজেনেই আমাদের ফিরে আসতে হলো।

পরের দিন বেলা নটার সময় যন্ত্রপাতি নিয়ে আবার আমরা ওই ছোট্ট দ্বীপে হাজির হলুম। বেলা বারোটার সময় কুয়াশার মধ্য দিয়ে আবছা দেখা গেলো সূর্যকে ক্রনোমিটার এগিয়ে দিয়ে রুদ্ধশ্বাসে ঘোষণা করলুম, দুপুর বারোটা।

হ্যাঁ, দক্ষিণ মেরুই বলে দূরবিনটা আমার হাতে তুলে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমে। দিগন্তের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্য ঠিক আধখানা ফালি হয়ে আছে।

একটা কালো নিশেন উড়িয়ে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো। কালোর মধ্যে সোনালি হরফে তাঁর নামের আদ্যক্ষর লেখা; সূর্যের শেষ শিখা পড়ে সেই সোনার অক্ষরটি জ্বলজ্বল করতে লাগলো।

তারপর সূর্যের দিকে ফিরে তাকিয়ে শেষ রশ্মিটুকু লক্ষ্য করে বললেন, বিদায় সবিতা, বিদায়! এবার তুমি বিশ্রাম নাও এই স্বাধীন সমুদ্রের তলায়, মিলিয়ে যাক তোমার নক্ষত্র দুতি। তারপর আমার নতুন দেশে নেমে আসুক ষান্মাষিক তমি।।

বনাম তুষারম

পরদিন, বাইশে মার্চ, সকাল ছটা থেকেই ফেরার আয়োজন শুরু হলো। সন্ধ্যালোকের শেষ ঝলশানিটুকু যেন নিকশ কালো রাত্রির মধ্যে গলে যাচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডায় আমরা থেকে-থেকে কেঁপে উঠছি। আকাশে ক্রমশ তারাদের দীপ্তি বেড়ে যাচ্ছে, আর তারই মধ্যে ঝলমল করছে কুমেরুর সেই আশ্চর্য মেরুতারা।

জলাধারগুলি ভর্তি করে জলের তলায় ডুব দিলে নটিলাস। হাজার ফুট। নিচে আস্তে, ঘণ্টায় পনেরে মাইল বেগে, ফিরে চললো উত্তর দিকে। সন্ধ্যাবেলাতেই সে হিমশৈলের তলা দিয়ে ফেরা শুরু করলো!

রাত যখন তিনটে, এক দারুণ ঝাঁকুনিতে আমার ঘুম ভেঙে গেলো। উঠে বসত-না-বসতেই আবার এক ঝাঁকুনির চোটে মেঝেয় ছিটকে পড়লুম আমি। কোনোরকমে দেয়াল ধরে-ধরে সেলুনে গিয়ে দেখি তখনো আলো জ্বলছে বটে, কিন্তু সারা ঘরে যে প্রলয় হয়ে গেছে একটু আগে। দেওয়ালের ছবিগুলো বেঁকে গেছে, ট্যারাবাঁকা হয়ে ঝুলছে তারা, আশবাবপত্র এলোমেলো ছিটকে পড়েছে। বোঝা গেলো নটিস হঠাৎ কোন কিছুর সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে কাৎ হয়ে পড়ে গেছে। বাইরে মস্ত শোরগোল শোনা গেলো, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর দেখা পাওয়া গলো না! গভীরতা মাপবার যন্ত্র দেখা গেলো তখনও এক হাজার ফুট নিচেই রয়েছে।

ক্যাপ্টেন নেমে এলেন একটু পরেই; চোখমুখে দারুণ উদ্বেগের ছাপ। হঠাৎ একটি হিমশৈল না, উল্টে যাওয়ার সময় নটিলাস-এর উপর এসে পড়েছে। এখন অবশ্য আস্তে আস্তে ভেসে উঠছে পাহাড়টা, সেই সঙ্গে নটিলাসকেও তুলে ধরছে একটু-একটু করে, আর সেই জন্যেই নটিলাস নাকি এখনো কাৎ হয়ে পড়ে আছে বরফের উপর। ধারগুলো খালি করে ফেলে মাল্লারা প্রাণপণে চেষ্টা করছে নটিলাস কে মুক্ত করতে, কিন্তু বিপদের আশঙ্কা তাতে একটুও কমছে না। নটিলাসকে যে আস্তে-আস্তে তুলে ধরছে সেই হিমশৈল, তা গভীরতা মাপবার যন্ত্র দেখেই বোঝা গেলো, কারণ যন্ত্রে একটু-একটু বরে গভীরতা হ্রাস পাচ্ছে। এই তুলেশরা যদি বন্ধ করা না-যায় তাহলে জাতিলের মধ্যে পড়বে নটিলাস, জাতার মধ্যে গম যেমন ধেৎলে যায় তেমনিভাবে উপরের আর নিচের বরফের মধ্যে ধেৎলে চ্যাপ্টা হয়ে যাবে।

কিন্তু আপাতত এই আশঙ্কাকে নস্যাৎ করে একটা মস্ত ঝাঁকুনি দিয়ে আবার ধীরে-ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এলো দেয়ালগুলো। দশ মিনিটের মধ্যেই আগের মতো আবার জলের মধ্যে ভাসতে লাগলো জাহাজ। কিন্তু জানালা দিয়ে যে দৃশ্য চোখে পড়লো, তা আমাকে আতঙ্কে ভরে দিয়ে গেলো। উপরে-নীচে ডাইনে-বাঁয়ে চারপাশে বরফের অবরোধ, আর তারই মধ্যে এতটুকু সংকীর্ণ জলের মধ্যে ভাসছে নটিলাস। হিমশুভ্র বরফের উপর তীব্র আলো এসে পড়েছে জাহাজ থেকে, আর প্রতিফলিত হয়ে তীব্র বিচ্ছুরণে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

আস্তে-আস্তে সামনে এগোতে থাকে নটিলাস। কিন্তু তক্ষুনি যেন তীব্র আলোয় চোখ অন্ধ হয়ে গেলো। নটিলাস চলছে বলেই সেই তীব্র শুভ্র প্রবল আলো যেন আরো বেশি করে

চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে গেলো। জানালা বন্ধ করে দিয়েও প্রথমটায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিলাম না। যেন এই প্রবল বিচ্ছুরণ দৃষ্টিশক্তি হরণ করে গেছে।

প্রাতঃকালে আবার ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি লাগলো; বুঝতে পারলুম বরফের দেয়ালে বা খেয়েছে নটিলাস! এবার নটিলাস ধীরে ধীরে পিছোতে লাগলো খোলা জলের পথ পাবার জন্য। কিন্তু সাড়ে আটটার সময় যখন পিছনেও আবার প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো, তখন বুঝতে পারলুম দক্ষিণে যাবার পথও আর নেই।

আর সেই কথাই গম্ভীরভাবে ঘোষণা করলেন ক্যাপ্টেন নেমো! জানালেন, প্রফেসর আবোন, আমরা আটকা পড়েছি। এবার তুষারমরুর সঙ্গে সরাসরি লড়াই ঘোষণা হলো।

নেড আর কোনসাইল তখন সেখানে বসে ছিলো। ক্যাপ্টেন নেমোর কথা শেষ। হবার আগেই নেড টেবিলের উপর এক প্রচণ্ড ঘুষি বসিয়ে দিলে। কোনসাইল টু শব্দটিও না-করে বিবর্ণ মুখে বসে রইলো। আমি কোনো কথা না-বলে ক্যাপ্টেন নেমোর দিকে তাকিয়ে রইলুম। বুকের উপর আড়াআড়িভাবে দু-হাত ভাজ করে গম্ভীরভাবে স্থির দাঁড়িয়ে আছেন তিনি-মুখবর্ণ পাণ্ডুর, শুধু চোখ দুটি অস্বাভাবিক ভাবে জ্বলছে।

একটু পরেই ক্যাপ্টেন আমাদের এই বিপন্ন অবস্থার সব ভয়ংকর সম্ভাবনার কথা ব্যাখ্যা করে বললেন। পরিস্থিতি যে-রকম দাড়িয়েছে, তাতে যদি চারপাশের বরফের বিস্তার নটিলাসকে চুর্ণ নাও করে, বাতাসের ট্যাঙ্কে যতনি হাওয়া ঘরে, তাতে দু-দিন চলে নটিলাস-এর। একটানা ছত্রিশ ঘণ্টা জলের তলায় আছে নটিলাস, আর আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে বাতাসের ভাড়াও ফুরিয়ে যাবে। ফলে মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টাই সময় আছে হাতে-

তারই মধ্যে যেমন করে হা্তে এই বরফের অবরোধের মধ্যে পথ কেটে বেরিয়ে পড়তে হবে নটিলাসকে।।

এর মধ্যেই নটিলাস-এর বারোজন ডুবুরি একেকটা কুড়ুল হাতে বরফের মধ্যে নেমে পড়েছিলো। নেড ল্যাণ্ড আর ক্যাপ্টেন নেমোও গিয়ে কুড়ুল হাতে তাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। এখানকার বরফ প্রায় তিরিশ ফুট পুরু: নটিলাস যাতে গলে যেতে পারে, সেই জন্য যত বড় গর্ত খুঁড়তে হবে তার জন্য ৭০০০ ধন-গজ বরফ সরানো দরকার। ক্ষিপ্রহাতে বরফ কাটা শুরু হলো। একেকটা বরফের চাঙড় মূল তূপ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে ডিগবাজি খেয়ে ভেসে উঠতে লাগলো উপর দিকে, আর একটু একটু করে পথ হতে লাগলো।

ঘণ্টা দুয়েক পর নেড ল্যাণ্ড ও অন্যান্যরা ক্লান্ত হয়ে বিশ্রামের জন্য ফিরে এলো; এবার যাদের হাতে বরফ কাটার ভার পড়লো, তাদের মধ্যে আমি আর কোনসাইলও রইলুম। দু-ঘণ্টা পরে বিশ্রামের জন্য নটিলাস-এ ফিরে এসে শিরস্ত্রাণ খুলতেই স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ইতিমধ্যেই নটিলাস-এর বাতাস আস্তেআস্তে ভারি আর দূষিত হয়ে উঠছে।

কিন্তু এভাবে কাজ করে কোনো ফল হবে বলে মনে হলো না। প্রথমত ৭০০০ ঘন গজ ব্রফ সরাতে হলে অন্তত পাঁচদিন ধরে একটানা বরফ কাটতে হবে আমাদের। অথচ হাওয়া ফুরিয়ে যাবে দু দিনেই। আর, দ্বিতীয়, বরফ খুড়েই বা কি লাভ? কারণ এই নিদারুণ ঠাণ্ডায় কিছুক্ষণের মধ্যেই টলমলে জলও বরফ হয়ে জমে যাচ্ছে–যেখানটাই খুড়ছি, সেখানটায় পরক্ষণেই আবার বরফের রাশি নিরেট কঠিন ধবল অট্টহাসির মতো

জমে যাচ্ছে-যেন কোনো তুহিনদন্তিল নিষ্টর ব্যঙ্গ করে, যেন এই পাষাণ তুষারম আমাদের সমস্ত চেষ্টাকে উদ্দেশ করেই বল হাশে ফেটে পড়ছে!

আর নিষ্ফল চেষ্টার মধ্যেই পরদিন উপস্থিত হলো বাতাসের অভাবে শ্বাসকষ্ট। সেই সঙ্গে আরো ভয়ংকর বিপদের পূর্বাভাস হিসাবে দেখা গেলো বরফের ছাদ ও দুপাশের দেয়াল রাতারাতি আরো পুরু হয়ে উঠেছে আর অনেকখানি এগিয়ে এসেছে নটিলাস-এর দিকে। জাহাজের সামনে পিছনে বোধহয় দশ ফুট করেও জল নেই।

ক্যাপ্টেন নেমো আর-একটি সমাধান বের করলেন মাথা খাটিয়ে। নটিলাস, এর বড়-বড়ো চুল্লিতে জল গরম করে সেই টগবগে জল পিচকিরির মতো চারপাশের দেয়ালে ছড়িয়ে দিতে লাগলেন। ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রা, অবস্থা ঈষৎ নিয়ন্ত্রণে এলো। রাত্রির মধ্যেই তাপমাত্রা উঠে এলো শূদ্যাঙ্কের এক ডিগ্রি নিচে। শূন্যাঙ্কের দু-ডিগ্রি নিচে জল জমে বরফ হয় বলে আপাতত আর বরফের দেয়ালের চাপে পিষ্ট হয়ে মরার ভয় রইলো না। কিন্তু ভীষণ হয়ে উঠলো শ্বাসকষ্ট।

মাত্র চার ঘন-গজ বরফ খুড়লেই নটিলাস পথ পাবে, সাতাশে মার্চ আমরা এই অবস্থায় পৌঁছলুম। আরো দুদিন দু রাত একটানা পুরো খাটলে হয়তো এই চার-গজ বরফের মধ্যে ছাদা করা যাবে। কিন্তু আর যে মোটেই বাতাস নেই। বেলা তিনটের সময় আমার চেতনা যেন বিলুপ্ত হয়ে এলো। অন্যদের অবস্থাও কিছু ভালো নয়। তবু তারই মধ্যে পুরোদমে কাজ চললো। ইশশ করে নিশ্বাস নিচ্ছি আমরা, ঘূর্ণিরোগাক্রান্তের মতো টলছি, প্রচণ্ড ব্যথায় মাথার ভিতরটা ছিড়ে পড়তে চাচ্ছে; তবু তারই মধ্যে অনেকটা কাজ এগিয়েছে আমাদের : আর মাত্র দু-গজ বরফ কাটতে হবে।

ছদিন হলো এই ভাবে বন্দী হয়ে আছি। ক্যাপ্টেন নেমোরও নিশ্চয়ই খুব কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু তিনি এমন অবিচল আছেন যে তাকে দেখে কিছুই বোঝবার জো নেই। যখন আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়, তখন নেমো মরিয়া হয়ে স্থির করলেন শেষ স্তরটুকু তিনি নটিলাসকে পূর্ণবেগে চালিয়ে বরফের দেয়াল ভেঙে চুরমার। করে বেরিয়ে যাবেন। নটিলাস-এর জলাধারে জল ভরা হলল, ক্রমশ ভারি হয়ে উঠলো নটিলাস। তারপরেই প্রচণ্ড শব্দে, বিস্ফোরকের মতে, বরফের স্তর কাটিয়ে নটিলাস নিচে ডুবে গেলো।।

পূর্ণবেগে উত্তরদিকে ছুটে চললো নটিলাস। কিন্তু আর কতক্ষণ এভাবে থাকবে? আরো একটা দিন? পুরো একটা দিন? ততক্ষণ আমরা বেঁচে থাকতে পারবো?

আমার আর হুঁশ ছিলো না, আচ্ছন্নের মতো পড়ে আছি নটিলাস-এর সেলুনে, আর কোনসাইল ও নেড তাদের জীবন বিপন্ন করে আমার নাকের কাছে ছোট্ট একটা অক্সিজেনের টিউবের শেষ বাতাসটুকু ধরে আছে।

মাত্র বিশ ফুট বরফের তলা দিয়ে যাচ্ছিলো তখন নটিলাস। হঠাৎ জাহাজের পিছন দিকটা হেলে পড়লো, মাথা উপর দিক করে মস্ত দুরমুশের মতো প্রচণ্ড বেগে নটিলাস আছড়ে পড়লো বরফের ছাদে। তারপর একটু পিছিয়ে আবার সেই আগের জায়গাতেই হাতুড়ির মতো ধাক্কা খেয়ে বরফ ভেঙে ছিটকে বেরিয়ে গেলো নটিলাস। আর তক্ষুনি হু-হু করে উনপঞ্চাশ পবনের বেগে ভিতরে ঢুকলোখোলা হাওয়া।

নটিলাস-এর বহিদ্বার খুলে দেয়ায় খোলা হাওয়া এসে ঢুকছে বাধভাঙা বন্যার মতো।

গগনের মাসকুণ্ডলী

উত্তমাশা অন্তরীপ থেকে আমাজন পর্যন্ত চঞ্চল নটিলাস ছুটে এসেছে; কিন্তু আমেরিকার উপকূলের কাছে যাচ্ছে না কখনোই; হয়তো তীরের কাছে যাওয়া বা উপকূলের জাহাজের মুখখামুখি পড়ার কোনো দৈব সুযোগ করে দেয়াও ক্যাপ্টেন নেমোর অভিপ্রেত নয়।

বিশে এপ্রিল বাহামার কাছে দিয়ে সাতশো ফ্যাদম জলের মধ্য দিয়ে ছুটে যাচ্ছিলো নটিলাস, আর তার বৈদ্যুতিক আলোয় কালো জল আলো হয়ে উঠেছিলো।

নেড ল্যাণ্ড যখন আমাকে জানলায় ডেকে নিয়ে গেলো, তখন বেলা এগারোটা বাজে।

দেখুন, কী ভীষণ জানোয়ার?

ভীষণই বটে! যেন কিংবদন্তির পাতা থেকে উঠে এসেছে সমুদ্রের এই অষ্টবাহ ড্রাগন। অতিকায় একটা কালামারি সে, বোধ হয় বত্রিশ ফিট হবে দৈর্ঘ্যে। প্রচণ্ড বেগে সে ছুটে আসছিলো নটিলাস-এর দিকে। নোষে জলে উঠেছে তার সবুজ চোখ দুটি, মাথা থেকেই বেরিয়েছে তার আটটি কদাকার ও ভয়ানক পাশ, গরগনের নাগকুণ্ডলীর মতো মাথা থেকেই তা কিলবিল করে জলে আড়াচ্ছে। তার কঠিন চঞ্চুটা কেবলি খুলছে আর বন্ধ হচ্ছে—আর ধারালো দাঁতে সাজানো তার কঠিন জিটি লকলক করে বেরিয়ে আসছে। অন্তত পঞ্চাশ হাজার পাউন্ড ওজন হবে এই সিন্ধুদানবের। ভীষণ রোষে মুহুর্মুহ বদলে যাচ্ছে তার গায়ের রঙ-এই ধূসর, আবার পরমুহূর্তেই লালচে বাদামি।

নটিলাস-এর উপস্থিতিই যে তার এই প্রবল রোষের কারণ তা বুঝতে আমাদের দেরি হলো না। আট হাতে সে অড়িয়ে ধরতে চাচ্ছে নটিলাসকে; কাচের ওপাশে বিষম রোষে সে প্রচণ্ডভাবে আছড়াচ্ছে তার অষ্ট পাশ। আর ইস্পাতে-মোড়া জাহাজকে মোটেই আঁকড়ে ধরতে পারছে না বলে আরো ক্রুদ্ধ ও প্রচণ্ড হয়ে উঠছে প্রতিমুহূর্তে।

দৈবই আমাকে এই ভীষণ দানবের সম্মুখীন করে দিলে। এই সুযোগ কিছুতেই নষ্ট করা উচিত হবে না। ভয় জয় করে তাই কাগজ পেন্সিলে তার একটা ছবি আঁকতে বসে গেলুম আমি। ততক্ষণে জানলার ওপাশে আরো কতগুলি সিন্ধুদানবের আবির্ভাব হয়েছে, যেন কোনো বিক্ষুব্ধ মিছিল করে তারা জলের এই মৃত জন্তুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে এলো। লোহার চাকায় তাদের চঞ্চুর মুহুর্মুহু আঘা শোনা গেলো। গুণে দেখি সংখ্যায় তারা সাত : সবাই ক্ষিপ্তের মতো নটিলাসকে আক্রমণ করতে চাচ্ছে।

হঠাৎ থরথর করে কেঁপে উঠেই নটিলাস নিশ্চল হয়ে গেলো।

কল খারাপ হয়ে গেলে নাকি? জিগেস করলুম আমি।

বোধ হয় না, নেড বললে, কারণ নটিলাস তো ভেসেই আছে।

ভেসে আছে বটে, কিন্তু এগোচ্ছে না। চাকা ঘুরছে না আর। পরক্ষণেই ফাস্ট অফিসারকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন ক্যাপ্টেন নেমো। অত্যন্ত গম্ভীর ও চিন্তাভারাতুর তাঁর মুখ। আমাদের দিকে দৃকপাত না-করেই সোজা জানলার কাছে গিয়ে পড়ালেন তিনি— সেই অক্টোপাসগুলোর দিকে তাকিয়ে তার সেই দুর্বোধ্য জটিল ভাষায় কতগুলো নির্দেশ

দিলেন তিনি। তারপর জানলার উপর লোহার পর্দা ফেলে দেয়া হলো। ফাস্ট অফিসার ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন।

মাঝখানে অনেকদিন ক্যাপ্টেন নেমোর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। অত্যন্ত বিমর্ষ দেখালো তাকে, ঈষৎ শোকাকুল।।

তখনও ভয়ংকর বিপদটা সম্বন্ধে সচেতন হইনি আমি।

অনেকগুলো অক্টোপাস জড়ো হয়েছে দেখছি। হ্যাঁ, প্রফেসর। আর এদের সঙ্গেই হাতাহাতি লড়তে হবে আমাদের।

হাতাহাতি?

হ্যাঁ, কারণ ওদের শুঁড়ে পেঁচিয়ে গিয়েই নটিলাস-এর চাকা বন্ধ হয়ে গেছে।

কিন্তু—

ওদের শরীর এত নরম যে আমার বৈদ্যুতিক গুলি কোনো কাজেই আসবে না—কারণ কোনো বাধা না-পেলে, ধাক্কা না-লাগলে, ওই গুলি ফাটে না। কাজেই কুড়ল দিয়েই লড়াই করতে হবে আমাদের।

আর হারপুন? নেড যুদ্ধের সম্ভাবনায় লাফিয়ে উঠলো। অবিশ্যি যদি আমার সাহায্য সম্বন্ধে আপনার কোনো আপত্তি না থাকে।

কোনোই আপত্তি নেই, মিস্টার ল্যাণ্ড।

নটিলাস ততক্ষণে জলের উপর ভেসে উঠেছে। নটিলাস-এর একটি মাল্লা বহিদ্বার খুলে দিলে। সঙ্গে সঙ্গে লোহার সিঁড়ি বেয়ে কিলবিল করে নেমে এলো একটা মস্ত সাপের মতো শুঁড়–কিংবা তাকে বাহুও হয়তো বলা যায়; আর মাথার উপর আরো কতগুলো শুঁড় দুলতে লাগলো। কুড়লের এক ঘায়ে সেই ভয়ংকর বাহুটা দু-টুকরো করে দিলেন ক্যাপ্টেন নেমো।

প্ল্যাটফর্মে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় ভীষণ কাণ্ড হলো! আচম্বিতে একটা শুঁড় নেমে এসে সিঁড়ির কাছের সেই মাল্লাটিকে পাকে পাকে পেঁচিয়ে নিয়ে এক হ্যাচকা টানে বাইরে তুলে নিয়ে গেলো। চীৎকার করে উদ্যত কুঠার হাতে ক্যাপ্টেন নেমো তার অনুসরণ করলেন। আমরাও পিছন পিছন উঠে এলুম।

সেই ভীষণ দৃশ্য ভাবলে এখনো গায়ে কাঁটা দেয়। শুঁড়ে পেঁচিয়ে সেই হতভাগ্য লোকটাকে শূন্যে দোলাচ্ছে সেই ভয়ংকর অক্টোপাস আর সেই অবস্থাতেই আর্তকণ্ঠে সে চেঁচিয়ে উঠছে : বাঁচাও বাঁচাও? ফরাসি ভাষায় সেই আর্তনাদ শুনে আমি চমকে উঠলাম। নটিলাস-এ এতদিন তাহলে আমি ছাড়া আরোএকজন ফরাসি ছিলো, আর আজ মৃত্যু তার উদ্দেশে থাবা বাড়িয়েছে!

আট বাহুর ভীষণ বাঁধনে লোকটা হারিয়ে গেলো। কে তাকে ওই মরণআলিঙ্গন থেকে বাঁচাব?

ক্যাপ্টেন নেমে কুঠার তুলে লাফিয়ে পড়লেন অক্টোপাসটার উপর, আরেকটা বাহু ছিন্ন করে দিলে তার কুঠার। ফাস্ট অফিসারটি তখন অন্য অক্টোপাসগুলোর সঙ্গে প্রচণ্ড যুদ্ধ করে চলেছেন। তিনজনে নেড, কোনসাইল আর আমি পাগলের মতো কুঠার চালাচ্ছি তখন। সাতটা বাহু কেটে ফেলার পরও শেষ বাহুটায় লোকটাকে শূন্যে তুলে ধরে নাড়াচ্ছে সেই সিন্ধুদানব। কিন্তু যেই ক্যাপ্টেন নেমো তার দিকে ছুটে গেলেন, অমনি তার পেটের থলি থেকে ঘন কালো রঙের একরকম কালি উগরে দিলে সেই অক্টোপাস, আমাদের চোখ যেন অন্ধ হয়ে গেলো। যখন দৃষ্টি ফিরে পেলুম ততক্ষণে সেই কালামারি জলের তলায় পালিয়েছে, আর সেই হতভাগ্য মাল্লাটির কোনো চিহ্নই নেই আশপাশে।

রাগে ক্ষোভে জ্ঞানশূন্তের মতো বাকি কালামারিগুলোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লুম আমরা। সেই সর্পকুণ্ডলীর মত বাহুগুলো ছিটকে পড়তে লাগলো কুঠারের ঘায়ে, রক্তে আর কালো কালির স্রোতে প্ল্যাটফর্ম স্পেসে গেলো। কিছুতেই যেন সেই ভীষণ শুঁড়ের অরণ্য ফুরোয় না-যেন ছিন্ন বাহুমূল থেকেই নতুন বাহু গজাচ্ছে বারে বারে। নেড ল্যাণ্ড তার হারপুন আমূল বসিয়ে দিচ্ছে কালামারিগুলোর সবুজ চোখে। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে একটা শুঁড় তাকেও পেঁচিয়ে ধরলো কঠোরভাবে, আতঙ্কে ও বিভীষিকায় আমার বুক যেন তখন ফেটে যাবে, কিন্তু ক্যাপ্টেন নেমোর কুঠার তড়িৎবেগে দু-টুকরো করে ফেললো সেই ভীষণ শুঁড়, আর মৃত্যু পাশ থেকে বেরিয়ে এসে নেড় তার হারপুন আমূল বসিয়ে দিলে সেই কালামারির তিন হৃৎপিণ্ডে।

শোধবোধ হলো, ক্যাপ্টেন নেমো বললেন নেড ল্যাণ্ডকে।

নেড কোনো কথা না-বলে হারপুন চালাতে চালাতেই একটু নুয়ে তাঁকে অভিবাদন করলে।

কেউ যদি জিগেস করে তোমার জীবনে ভীষণতম পনেরো মিনিট কবে এসেছিলো, তাহলে এই ভয়ংকর যুদ্ধের কথাই বলব আমি। পনেরো মিনিটের মধ্যেই সব তছনছ হয়ে গেলো। অক্টোপাসগুলো বিধ্বস্ত হয়ে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লো, আর ঢেউয়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলে তাদের ছিন্ন দেহ। আর ক্যাপ্টেন নেমো রক্ত মেখে ঘেমে নিশ্চল পঁড়িয়ে রইলেন প্ল্যাটফর্মে, যে-সমুদ্র তাঁর একজন অনুচরকে গিলে খেলো তার দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ বেয়ে অবোরে জল গড়িয়ে পড়লো।

নটিলাস-এর রোষ

ভিক্তর যুগো ছাড়া আর কারো লেখনীই বোধ করি বিশে এপ্রিলের এই ভীষণ যুদ্ধের বর্ণনা দিতে অক্ষম। অন্তত আমি যে যা ঘটেছিলো তার কিছুই ফুটিয়ে তুলতে পরি নি তা খুব ভালো করেই জানি। আর ক্যাপ্টেন নেমোর বিষাদ, বিলাপ ও অস্থিরতা ফোটাবার ক্ষমতাও কবি ছাড়া আর কারো নেই; আর সেই কবিকেও নিশ্চয়ই মহাকবি যুগোর মতোই নিপুণ হতে হবে।

ইতিমধ্যে আমেরিকার সিন্ধুসলিল ছাড়িয়ে এসেছে নটিলাস; য়ুরোপের উপকূল ধরেই চলেছি এখন আমরা। নটিলাস কখনো জলের উপর ভেসে ওঠে, কখনো ডুব দিয়ে যায় অনেক দূর অবধি। পয়লা জুন নটিলাস যখন ভেসে চলেছে এমন সময় হঠাৎ যেন গুমগুম করে মেঘ ডেকে উঠলো। স্বচ্ছ নীল আকাশে মেঘের লেশমাত্র নেই; অথচ তাহলে এ কীসের শব্দ?

নেড, কোনসাইল আর আমি তখন প্ল্যাটফর্মে দাড়িয়েছিলুম। হঠাৎ পুবদিকে তাকাতেই দেখি মস্ত একটা কলের জাহাজ পূর্ণবেগে আমাদের দিকে ধাবমান–কয়েক মাইল দূর থেকেও দেখা গেলো তার চিমনি দুটো দিয়ে ভলকে-ভলকে কালো ধোঁয়া বেরিয়ে আসছে।

কিসের শব্দ হলল, নে? আমি জিগেস করলুম।

কামানের।

কীসের আহাজ ওটা, জানো?

দূর থেকে দেখে তো যুদ্ধজাহাজ বলেই মনে হয়। বোধ হয় আমাদের ডুবিয়ে দিতে চায়। এই জঘন্য নটিলাস-কে যদি ওরা জখম করতে পারে তো আমার কোনো ক্ষোভ নেই।

কোন দেশের জাহাজ, বুঝতে পেরেছে?

ভুরু কুঁচকে একটু তাকিয়ে নেড বললে, কোনো নিশেন তো দেখতে পাচ্ছি না। কোন দেশের জাহাজ বলা মুশকিল।

জাহাজটা ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসছে, বেশ দ্রুত তার গতি, কিন্তু তবু কোন নিশানেরই হদিশ পাওয়া গেলো না। নেড বলে উঠলো, নটিলাস-এর এক মাইল দূর দিয়ে গেলেও আমি সরে গিয়ে উঠবে জাহাজটায়। আপনাদেরও তা-ই করতে পরামর্শ দিই।

আমি কোনো উত্তর দেবার আগেই জাহাজের গলুয়ের কাছে খানিকটা শাদা ধোয়া জেগে উঠলো। পরক্ষণেই নটিলাস-এর পাশে জলে কী একটা যেন বিপুল শব্দে আছড়ে পড়লো-বিস্ফোরণের শব্দটা কানে এলো তার পরেই।

কী সাংঘাতিক! তাহলে ওরা যে আমাদের দিকে কামান দাগছে!

ভালোই তো! তাহলে ওরা আমাদের দেখতে পেয়েছে-জাহাজডুবির পর ভেলায় ভাসছি বলে ভুল করেনি—এই মস্ত তিমিজিলকে দেখেই তারা কামান দাগছে!

নেড ভুল বলে নি! সত্যি, এতদিনে সারা জগৎ নিশ্চয়ই এই ডুবোজাহাজের কথা জেনে গেছে। আব্রাহাম লিঙ্কন থেকে নেড যে-হারপুন ছুঁড়েছিলো, তা যে নটিলাস-এর ইস্পাতের খোল ভেদ করতে পারে নি তা দেখেই নিশ্চয়ই ক্যাপ্টেন ফ্যারাগুট বুঝতে পেরেছিলেন কীসের পিছনে তিনি ছুটেছিলেন। পৃথিবীর সমস্ত দেশের যুদ্ধজাহাজ নিশ্চয়ই এতদিনে এই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটার খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে।

আমাদের চারপাশে তখন বৃষ্টির মতো কামানের গোলা এসে পড়ছে। এখনো বেশ দুরে আছে বলেই কোনো গোলাই নটিলাস-এর গায়ে এসে পড়ছে না। কিন্তু আশ্চর্য! গোলার শব্দ শুনেও নটিলাস-এর লোকজনেরা কোনো কৌতূহল প্রকাশ করছে না কেন? ক্যাপ্টেন নেমোই বা কী করছেন?

নেড চেঁচিয়ে উঠলো, এই সুযোগে নটিলাস থেকে পালাতেই হবে আমাদের। আসুন, ওদের সংকেত করি। হয়ত ওরা বুঝতে পারবে যে আমরা নির্বিরোধী সৎ মানুষ। বলে পকেট থেকে রুমাল বের করে নেড নাড়তে যাবে, এমন সময় কার কঠিন হাতের ধাক্কায় নেডের মতো পালোয়ানও ছিটকে পড়লো প্ল্যাটফর্মে!

পাষণ্ড! বাজের মতো ফেটে পড়লেন ক্যাপ্টেন নেমো। তুমি কি চাও যে নটিলাস-এর খড়্গ দিয়ে ওই জাহাজটাকে এফোঁড়-ওফেঁড় করার আগে তোমাকেই আমি গেঁথে ফেলি! সেই কণ্ঠস্বর যত না ভীষণ, তার চেয়েও ভীষণ তার দেহচ্ছবি। রক্তহীন শাদা তার মুখ, চোখের তারা দুটি মশালের মত উজ্জ্বল। নেডের কাধ ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে গর্জন করে উঠলেন তিনি। তারপর তাকে ছেড়ে দিয়ে ওই জাহাজকে উদ্দেশ্য করে মেঘের মতো গর্জে উঠলেন ক্যাপ্টেন নেমোত তুমি তাহলে জানো আমি কে! তুমি তাহলে জানো

নটিলাস কোন অভিশপ্ত জাতির জাহাজ। তোমাকে চিনতে আমার দেরি হয় নি, তোমার পতাকা না-দেখেও তোমাকে আমি চিনি। কিন্তু এই দ্যাখো আমার নিশেন—তোমাকে আজ দেখাই। বলেই দক্ষিণমেরুতে তিনি যে-নিশেন উড়িয়েছিলেন ঠিক তেমনি একটি কালো নিশেন উড়িয়ে দিলেন নটি লাস-এর উপর।

বোধ হয় তাঁর কথার উত্তরেই নটিলাস-এর হাতের উপর দারুণ শষে একটা গোলা এসে পড়লো-পড়েই ছিটকে তার পাশ দিয়ে সমুদ্রের জলে আছড়ে পড়লো। কঁধ ঝাঁকালেন ক্যাপ্টেন নেমো। আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, নিচে যান আপনি, সঙ্গীদের নিয়ে নিয়ে চলে যান।

আপনি কি জাহাজটাকে আক্রমণ করবেন ক্যাপ্টেন? আমি চেঁচিয়ে উঠলুম।

আকাশ নয়-আমি ওকে ডুবিয়ে দেবো।

না, না, তা করবেন না–

করবোই। ঠাণ্ডা হিম তার গলা, এ-সম্বন্ধে আপনাকে কোনো মতামত দিতে হবে না। যা আপনার কোনোদিনই দেখার কথা নয়, নিয়তি আজ তারই মুখেমুখি করেছে আপনাকে। আক্রমণ ওরা করেছে-প্রত্যুত্তর হবে ভয়ংকর। নিচে চলে যান।

কোন দেশের জাহাজ ওটা? কোথাকার?

আপনি জানেন না? আরো ভালো-অন্তত জাহাজটা কোন দেশের, এই রহস্য আপনার কাছে অজ্ঞাত থেকে যাবে। মিচে যান।

এই আদেশ মান্য না করে উপায় ছিলো না। ততক্ষণে নটিলাস-এর আরো পনেরোটি মাল্লা এসে ক্যাপ্টেন নেমোক ঘিরে দাড়িয়েছে-সেই ধাবমান জাহাজটির দিকে সেই একই প্রতিহিংসার দৃষ্টি নিয়ে অপলকে তাকিয়ে আছে তারা, কোনো পরম ঘৃণায় আর রোষে তারা যেন অগ্নিশিখার মতো জ্বলছে প্রত্যেকে। নিচে নামতে নামতে শুনলুম আরো একটি গোলা এসে আছড়ে পড়লো নটিলাস-এর উপর, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্যাপ্টেন নেমো রোষে গর্জন করে উঠলেন : আরো হানো তোমার গোলা, আরো। যত পারো নষ্ট করে তোমার ব্যর্থ গোলা। কিন্তু এটা জেনে রেখো, নটিলাস-এর খজকে এড়াবার ক্ষমতা তোমার নেই।

আর সহ্য হলো না, ছুটে চলে এলুম আমার ঘরে। নটিলাস-এর গতি বৃদ্ধি পেলো, বোঝা গেলো নটিলাস কামানের পাল্লা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। ওই যুদ্ধজাহাজ হন্যে হয়ে ঘুরুক নটিলাস-এর পিছনে, তারপর নটিলাস এক সময়। তার অমোঘ উত্তর দেবে-প্রচণ্ড সেই উত্তর চুরমার করে ফেলবে ওই জাহাজ।

এই পরিণতি অনিবার্য। আমি জানি। ক্যাপ্টেন নেমো যেন আদিম দেবতাদের মতো গর্জে উঠেছেন এখন, কোনো বন্য দেবতা চরম তার রোষ যখন পর মতে নামে, তখন নিস্তার নেই। তার চোখ অলাতচক্রের মতো জ্বলে উঠেছে, আর তাই দেখেই বুঝেছি আমি। প্রকৃতির আদি শক্তিগুলো যখন জেগে ওঠে, বাজ বরুণ আগুন যখন ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তখন কে তাদের ঠেকাবার সাধ্য রাখে।

এই উন্মাদ জাহাজ ছেড়ে পালাতেই হবে আমাকে। এতদিন নেডের প্রস্তাব আমার সম্পূর্ণ মনঃপূত হয়নি, কিন্তু এখন আর কোনো সংশয় নেই।

আর সঙ্গে সঙ্গে কানে এলো জলাধারে জল ঢোকার শব্দ। নটিলাস জলে ডুব দিচ্ছে। আক্রমণটা তাহলে অলের তলা থেকেই হবে? রাতের অন্ধকারে নটিলাস-এর খড় আক্ষরিকভাবে একেঁড়-ওফোড় করে দেবে ওই জাহাজকে! হঠাৎ অনুভব করলুম নটিলাস যেন পাগল হয়ে উঠলো-প্রচণ্ড হয়ে হয়ে উঠলো তার গতিবেগ, থরথর করে কেঁপে উঠলো সমস্ত জাহাজ। তারপর একটা ছোট্ট ঝাঁকুনি লাগলো শুধু-আর কিছু নয়।

উন্মাদের মতো সেলুনে গিয়ে ঢুকলুম। গিয়ে দেখি জানলার পাশে ক্যাপ্টেন নেমো পঁড়িয়ে আছেন একা, গম্ভীর, নিশ্চপ, অদ্ভুত দুর্ভেদ্য, বিষন্ন। তাকিয়ে দেখছেন কেমন করে অত বড় যুদ্ধজাহাজটা ডুবে যাচ্ছে সমুদ্রের জলে।

আস্তে ডুবছে জাহাজটা; একটু-একটু করে জল ঢুকছে তার পাটাতনে-তারপরেই মস্ত একটা বিস্ফোরণে গোটা পাটাতনটা চৌচির হয়ে উড়ে গেলো। তারপর জাহাজটা দ্রুত নেমে এলো সিন্ধুতলে। আর্ত মানুষ, সমরসজ্জা, মস্ত হাল, ঘূর্ণমান চাকা—সব তলিয়ে গেলো অথৈ জলে, সেখানে সিন্ধুতলের বালি তাদের জন্য সমাধি রচনা করে অপেক্ষা করে আছে।

ক্যাপ্টেন নেমোর দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখি অকম্পিত তিনি লক্ষ্য করলেন সক কিছু। সব যখন শেষ হয়ে গেলো নিজের সেই সন্ন্যাসীর ঘরে গিয়ে ঢুকলেন তিনি। দেয়ালে সারি-সারি ঝুলছে চিরযুগের বীরপুরুষদের ছবি : আর তারই তলার আরো-একটা ছবির

www.bengaliebook.com

সূচিপত্র

তলায় দুই হাত প্রসারিত করে আর্ত মানুষের মতো নতজানু হয়ে বসে পড়লেন ক্যাপ্টেন নেমো।

ছবির ফ্রেমের মধ্য থেকে এক তরুণী মহিলা আর দুটি ছেলেমেয়ে অপলকে তাকিয়ে তাকিয়ে যেন দেখলো এই মস্ত মানুষটির দেহ কোন প্রবল কান্নার বেগে বারেবারে দুলে উঠলো।

পাগল হে নাবিক!

ঝপঝপ করে বন্ধ হয়ে গেলো সবগুলি জানলা। নটিলাস-এর ভিতরটা অন্ধকার আর থমথমে। পাগলের মতো এই ভয়ংকর পাতাল ছেড়ে ছুটে পালাচ্ছে নটিলাস–কিন্তু বিবেকের হাত থেকে সে পালাবে কোথায়?

খ্যাপা জানোয়ারের মতো কখন সে ভেসে ওঠে, কখনো সে ডুব দেয়, আর সারাক্ষণ প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলে। যেন অমোঘ বিবেকের দংশন এড়িয়ে পালাতে চাচ্ছে কোনো আর্ত, ব্যর্থ, ব্যাকুল মানুষ।

এক-এক করে কুড়ি দিন কেটে গেলো একই ভাবে। দিন নেই, রাত্রি নেই, শুধু এক ভয়ংকর গতি সর্বক্ষণ। কারো দেখা মেলে না। আমরা তিন দৈবাত যাত্রী শুকনো মুখে বসে থাকি। আর রাতের বেলায় শুনি পাগল অর্গানের আর্ত কলরোল। সময় নেই, অসময় নেই ঝমঝম করে কেবল আর্ত হৃৎপিণ্ডের মতো কঁদে ওই অর্গ্যান। যেন কোনো শনিতে-পাওয়া দিনরাত্রি হানা দিয়েছে এখানে।

আর নয়। পালাতেই হবে।

স্বপ্নের ঘোরে শুনি নি কথা কটি; ধড়মড় করে উঠে বসে দেখি নেড আমার উপর ঝুকে পড়ে ফিশফিশ করে বলছে, আর নয়। পালাতেই হবে। এবং আজ রাতেই।

কখন? আস্তে শুধোলুম।

রাত্রে। ওরা পাহারা সরিয়ে নিয়েছে। অথচ ডাঙা এখান থেকে কাছেই। কুয়াশার মধ্যে ঝাঁপসা দেখতে পেয়েছি আমি—কয়েক মাইল দূরে কালো তীরের রেখা।

তা-ই হবে। আজ রাতেই পালাবো।

নটিলাস তখন স্ক্যাণ্ডিনেভিয়ার উপকূল ধরে যাচ্ছে। সারা দিন ধরে আমি শেষবার ঘুরে বেড়ালুম নটিলাস-এর ঘরে-ঘরে। তার গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা, রত্নগৃহ —সমস্ত এই দশ মাসের স্মৃতিতে ভরে আছে। আমার দিনলিপিতে প্রতিদিনের কথা লেখা আছে, কিন্তু তবু কেমন অদ্ভুত ঘোরর মধ্যে সারা দিন কেটে গেলো।

রাত্রে খাবার সময় নেড চুপিচুপি জানিয়ে দিলে যে সাড়ে দশটায় চাঁদ উঠবে, তার আগেই অন্ধকার থাকতে থাকতে পালাতে হবে আমাদের।

আর রাতের অন্ধকারেই আবার কোন অফুরন্ত কান্বার প্রস্রবণ খুলে গেলো–বেজে উঠলো বিষয় অর্গ্যান।

সর্বনাশ!

ক্যাপ্টেন নেমো সেলুনে আছেন এখন–অথচ ওখান দিয়েই যে আমাকে যেতে হবে। ভয় করি আমি তাকে, তার মুখোমুখি দাঁড়ালে আমি দুর্বল হয়ে যাবে

এই আর্ত মানুষটিকে ছেড়ে তাহলে আর আমার পালানো হবে না।

সেলুনের ভিতরে সন্তর্পণে তাকিয়ে দেখি মিশমিশে অন্ধকারে ভূতের মতো বসে আছেন তিনি অর্গানে-ঝমঝম সেই আর্ত কদনের মধ্যে যেন কোনো-এক তৃতীয় ভুবন হাড়ে বেড়াচ্ছেন তিনি। আস্তে সেলুন পেরিয়ে এলুম আমি, পা টিপেটিপে, সন্তর্পণে।

লাইব্রেরির দরজা খুলে বেরিয়ে পড়বে, এমন সময় ক্যাপ্টেন নেমোর বুক চিরে এক দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। কে যেন আমাকে পেরেক ঠুকে আটকে দিলে সেখানে। দেখলুম উঠে দাড়ালেন তিনি আস্তে; নিঃশব্দে, বুকের উপর দুই হাত ভাঁজ করে, প্রেতের মতো এগিয়ে এলেন তিনি। আর তার আর্ত হৃদয় ছিড়ে এই কটি যন্ত্রণাহত কথা বেরিয়ে এলো। হা ভগবান। যথেষ্ট! যথেষ্ট! আর নয়!

মরিয়া হয়ে লাইব্রেরির মধ্যে দিয়ে ছুটে গিয়ে কয়েক লাফে সিঁড়ি টপকে প্ল্যাটফর্মে উঠে গেলুম। সেখানে নৌকোর মধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়তেই দেখলুম নেড আর কোনসাইলও আগে থেকে এসে বসে আছে সেখানে। আমার চেতনা তখন আচ্ছন্ন। সেই অনুতপ্ত কথা কটি এখনো যেন গুমরে উঠছে আমার দুই কানে।

শিগগির। বেরিয়ে পড়ো, এক্ষুনি! রুদ্ধশ্বাসে বলে উঠলুম আমি।

নেড হালে বসলো, আর কোনসাইল আংটা খুলে দিলে সন্তর্পণে। আর তক্ষুনি এক দারুণ কোলাহল উঠলো জাহাজে।

তবে কি ওরা জেনে ফেলেছে যে আমরা পালাচ্ছি! নেড তাড়াতাড়ি আমার হাতে একটা ছোরা গুজে দিলে। আর তখনই একটা প্রবল শোরগোল কানে এলো। মেলস্ট্রম! মেলস্ট্রম!

কী সর্বনাশ! মেলস্ট্রম!

আতঙ্কে আমার সর্বাঙ্গ হিম হয়ে এলো। শেষকালে নোয়ের উপকূলের সেই ভীষণ ঘূর্ণিপাকে এসে পড়লুম, যার হাত থেকে এমনকি মস্ত জাহাজেরাও রেহাই পায় না সচরাচর। কিন্তু পরক্ষণেই বোঁ করে ঘুরপাক খেয়ে ছুটে বেরিয়ে গেলো নৌকোটা, আর লোহার ফ্রেমে দারুণভাবে বা খেয়ে আমি আর্তনাদ করে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলুম!

পুনশ্চ

চো ফিরে এলো নবোয়ের উপকূলের এক ধীবরের গৃহে। চোখ খুলে তাকিয়ে দেখি নেড আর কোনসাই উদ্বিগ্নভাবে আমার দিকে ঝুকে আছে।

কী করে যে সে রাতে ওই ভীষণ ঘূর্ণিপাকের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি, তা আমরা কেউই জানি না।

লোফোডেন আইল্যাণ্ডের এই ধীবরের গৃহে বসে-বসে দু-মাস ধরে ফ্রান্সগামী জাহাজের প্রতীক্ষা করতে করতে আমার এই দশমাস জোড়া অভিজ্ঞতার কাহিনী লিখে ফেললুম। এখানে একটা কথাও নেই যা অতিরঞ্জিত, কি বিকৃত, কি অলীক কল্পনা। বরং বোধ হয় উনকথনের দোষই হয়েছে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু নটিলাস-এর কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। বারেবারে ওই অদ্ভুত ডুবোজাহাজটি হানা দেয় আমার মনের মধ্যে।

নটিলাস-এর কী হলো? মেলস্ট্রমের ওই ভীষণ মরণ-আলিঙ্গন থেকে সে কি বেরিয়ে যেতে পেরেছে? আর ক্যাপ্টেন নেমো? তিনি কি এখনো বেঁচে আছেন? এখনো তিনি কি তার প্রচণ্ড ও আর্ত হৃদয় নিয়ে প্রতিহিংসার সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? না কি আবর্তমান সিন্ধুজলের অবিরাম ঢেউ তার অন্তঃকরণ থেকে ঘৃণা আর রোষ মুছে দিয়ে তাকে শুদ্ধ সুন্দর ও মহান করে দিয়ে গেছে? কে তিনি, কোন দেশের মানুষ, কী তার পুরো নাম-এ-সব তথ্য কি কোনো দিনই জানতে পারবো আমি?

জানি না।

আমি শুধু সেই আর্ত, প্রবল, শুদ্ধ মানুষটির জন্য প্রার্থনা করতে পারি। আমার বাড়ির সামনে দিয়ে বেলাভূমি দেখা যায়, যেখানে একের পর এক ঢেউ ভেঙে পড়ে বারেবারে। তাদের সেই অবিরাম ও ছন্দোময় স্পন্দনের মধ্যেও হয়তো সেই একই প্রার্থনা বেজেবেজে ওঠে।